

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী

ইংলান্ডের শাস্তির কথা

সূচীপত্র

মুসলমান কাকে বলে	৫
ঈমানের পরীক্ষা	১৬
ইসলামের নিতৃপ্তি মানদণ্ড	২৪
আল্লাহর হৃত্য পালন করা দরকার কেন ?	৩২
ঝীন ও শরীয়াত	৪০

ইসলামের হাকীকত

সাইয়েদ আব্দুল আলা মওদুদী
অনুবাদ : মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

আল্লাহর হেদায়াত মেনে চলে আর কতকগুলো নিজের নফসের হৃকুম যতো কিংবা বাপ-দাদার প্রথা মতো অথবা মানুষের রচিত আইন অনুযায়ী করে তবে যতখানি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে ঠিক ততখানি কুফরির মধ্যে লিঙ্গ হবে। এ হিসেবে কেউ অর্ধেক কাফের, কেউ চার ভাগের এক ভাগ কাফের। কারো মধ্যে আছে দশ ভাগের এক ভাগ কুফরী আবার কারো মধ্যে আছে কুড়ি ভাগের এক ভাগ। মোটকথা, আল্লাহর আইনের যতখানি বিরোধিতা করা হবে ততখানি কুফরি করা হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বস্তুত কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার বান্দাহ হয়ে থাকা এবং নফস, বাপ-দাদা, বংশ-গোত্র, মৌলভী সাহেব, পীর সাহেব, জমিদার, তহশীলদার, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি কারো আনুগত্য না করারই নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাস হবে না। আর কারো দাসত্ব কবুল করবে না—এটাই হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির কাজ। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

فُلَّيَّاهُ الْكِتَبِ تَعَالَى إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ
وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ نُونِ اللَّهِ طَفَانٍ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهُدُوا بِإِنَّا مُسْلِمُونَ ۔ ال عمران : ٦٤

“(হে নবী !) আহলে কিতাবদের বল : আস, আমরা ও তোমরা এমন একটা কথায় একত্রিত হই, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য (অর্থাৎ তোমাদের নবীরা যা বলেছে, আমিও আল্লাহর নবী হওয়ার কারণে তাই বলছি।) তা এই যে, (১) আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোও বান্দাহ হবো না, (২) আল্লাহর উলুহিয়াতের সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবো না এবং (৩) আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেও নিজের অতিভাবক ও মালিক বলে মান্য করবো না। এ তিনটি কথা যদি তারা স্বীকার না করে তবে তোমরা তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান—অর্থাৎ আমরা এ তিনটি কথাই পুরোপুরি কবুল করে নিছি।”—সূরা আলে ইমরান : ৬৪

অন্যত্র বলা হয়েছে :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السُّمُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا
وُكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۔ ال عمران : ৮৩

“তোমরা কি আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতে চাও ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে । আর সকলেই তাঁর কাছে ফিরে যাবে ।”

এ দু'টি আয়াতে একই কথা বলা হয়েছে । তা এই যে, আসল দীন হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর আদেশ পালন করা । আল্লাহর ইবাদাতের অর্থ কেবল এটাই নয় যে, দিন-রাত পাঁচবার তাঁর সামনে সিজদা করলেই ইবাদাতের যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়ে যাবে । বরং দিন-রাত সর্বক্ষণ একমাত্র আল্লাহ তাআলার হৃকুম পালন করে চলাকেই প্রকৃতপক্ষে ইবাদাত বলে । যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা হতে ফিরে থাকা এবং তিনি যা করতে আদেশ করেছেন তা পূর্ণরূপে পালন করাই হচ্ছে ইবাদাত । এজন্য প্রত্যেকটি কাজে এবং প্রত্যেকটি হৃকুমের ব্যাপারেই কেবলমাত্র আল্লাহর খোঁজ নিতে হবে । নিজের মন ও বিবেক-বুদ্ধি কি বলে, বাপ-দাদারা কি বলে বা করে গেছেন, পরিবার, বংশ ও আঘীয়গণের মত কি, জনাব মৌলভী সাহেব আর জনাব পীর সাহেব কেবলা কি বলছেন, অমুক সাহেবের হৃকুম কি, কিংবা অমুক সাহেবের মত কি—এসব মাত্রই দেখবে না এবং সেই দিকে মাত্রই জঙ্গেপ করা যাবে না । আল্লাহর হৃকুম ত্যাগ করে এদের কারোও হৃকুম পালন করলে আল্লাহর সাথে শিরক করা হবে এবং যার হৃকুম মান্য করা হবে তাকে আল্লাহর মতো সম্মান দান করা হবে । কারণ হৃকুম দেয়ার ক্ষমতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার : ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِۚ﴾ “আল্লাহর হৃকুম ছাড়া মানুষ অন্য কারো হৃকুম মানতে পারে না ।” মানুষের ইবাদাত-বন্দেগী তো কেবল তিনিই পেতে পারেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার অনুগ্রহে মানুষ বেঁচে আছে । আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই তাঁর হৃকুম পালন করে চলছে । একটি পাথর অন্য পাথরের হৃকুম মতো কাজ করে না, একটি গাছ আর একটি গাছের আনুগত্য করে না, কোনো পশু অন্য পশুর হৃকুমবরদারী করে চলে না । কিন্তু মানুষ কি পশু, গাছ ও পাথর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা তো শুধু আল্লাহর আনুগত্য করবে, আর মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে অন্য মানুষের নির্দেশ মতো চলতে শুরু করবে ? একথাই কুরআনের উল্লেখিত তিনটি আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে ।

এ কুফর ও গোমরাহী কোথা হতে আসে এবং মানুষের মধ্যে এটা কিরণে প্রবেশ করে, অতপর এ সম্পর্কেই আলোচনা করবো । কুরআন শরীফ এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহকে অমান্য করার ভাব তিনটি পথে প্রবেশ করে ।

প্রথম পথ হচ্ছে মানুষের নিজের নফসের খাহেশ :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمْنِ اتَّبَعَ هَوَاءً بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ طَاْبِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الظَّلِيمِينَ ০ - القصص : ৫০

“আল্লাহর দেয়া বিধান পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি নিজের নফসের ইচ্ছামত চলে তার অপেক্ষা অধিক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে ? এ ধরনের যালেম লোকদেরকে আল্লাহ কখনই সৎপথের সঙ্কান দেন না।”

এর অর্থ এই যে, মানুষকে গোমরাহ করার মতো যত জিনিস আছে তার মধ্যে মানুষের নফসই হচ্ছে তার সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। যে ব্যক্তি নিজের খাহেশাতের দাসত্ব করবে, আল্লাহর বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান হবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, আরাম ও সুখ যে কাজে অধিক মিলবে সে কেবল সেসব কাজেরই সঙ্কান করবে এবং যেসব কাজে তা দেখতে পাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ঝঙ্কেপ করবে না। আর এসব জিনিস যেসব কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনও প্রস্তুত হবে না। আল্লাহ তাআলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ তাআলাকে তার খোদা রূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র খোদার শর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোনো প্রকারে আল্লাহর হেদায়াত লাভ করতে পারে না। কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে :

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاءً طَآفَاتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ০ أَمْ تَحْسَبُ
أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَشْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ طَاْبِنَ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

سَيِّلًا ০ - الفرقان : ৪৩-৪৪

“(হে নবী !) যে ব্যক্তি নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ ? তুমি কি এ ধরনের মানুষের পাহারাদারী করতে পার ? তুমি কি মনে কর যে, এদের মধ্যে অনেক লোকই (তোমার দাওয়াত) শোনে এবং বুঝে ? কখনও নয়। এরা তো একেবারে জন্ম-জানোয়ারের মত বরং তা অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট।”

যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। কোনো পশুকে আপনারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করতে দেখবেন না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য খায় যে পরিমাণ তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। আর যে জানোয়ারের জন্য যত কাজ নির্দিষ্ট করা হয়েছে প্রত্যেক জানোয়ার সে কাজই করে যায়। কিন্তু এ মানুষ এমনই এক শ্রেণীর পশু যে, সে যখন নফসের দাস হয়ে যায়, তখন সে এমন সব কাজ করে যা দেখে শয়তানও ভয় পেয়ে যায়।

মানুষের পথভূষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে এই যে, বাপ-দাদা হতে যেসব রসম-রেওয়াজ, যে আকীদা-বিশ্বাস ও মত এবং যে চাল-চলন ও রীতিনীতি চলে এসেছে তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকার দরুণ মানুষ তার গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহর হৃকুমের অপেক্ষাও তাকে বেশী সম্মানের যোগ্য বলে মনে করে। সেই রসম-রেওয়াজের বিপরীত আল্লাহর কোনো কোনো হৃকুম যদি তার সামনে পেশ করা হয়, তবে সে অমনি বলে গঠে বাপ-দাদারা যা করে গেছে; আমার বংশের যে নিয়ম বহুদিন হতে চলে এসেছে, আমি কি তার বিপরীত কাজ করতে পারি ? পূর্ব-পুরুষের নিয়মের পূজা করার রোগ যার মধ্যে এতখানি, আল্লাহর একনিষ্ঠ বাস্তা হওয়া তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে তার বাপ-দাদা এবং তার বংশের লোকেরাই তার খোদা হয়ে বসে। সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলে তা যে মিথ্যা দাবী হবে তাতে বিদ্যুমাত্র সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বড় কড়াকড়িভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَئْبِغُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا أَفْيَانَا عَلَيْهِ
أَبَأْغَا مَا أَوْلَوْكَانَ أَبَأْفُهمْ لَا يَعْقُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ - البقرة : ۱۷۰

“যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার হৃকুম পালন করে চল, তখন তারা শুধু একথাই বলে উঠেছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে, আমরা কেবল সে পথেই চলবো। কিন্তু তাদের বাপ-দাদারা যদি কোনো কথা বুঝতে না পেরে থাকে এবং তারা যদি সৎপথে না চলে থাকে, তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে ?”

অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا
وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءِنَا مَا أَوْلَوْكَانَ أَبَأْفُهمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ يَأْبَاهُ

الَّذِينَ أَمْنَوْا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَالٍ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ۱۰۴-۱۰۵۔ المائدة

“যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যে বিধান পাঠিয়েছেন তার দিকে আস এবং রাসূলের দিকে আস, তখনই তারা বলেছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলে গেছে, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু তাদের বাপ-দাদারা যদি আসল কথা জানতে না পেরে থাকে এবং তারা যদি সৎপথে না চলে থাকে তবুও কি তারা (অঙ্কভাবে) তাদেরই অনুসরণ করে চলবে ? হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের চিন্তা করা উচিত। তোমরা যদি সৎপথে চলতে পার, অন্য লোকের গোমরাহীতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তোমাদের সকলকেই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাজের ভাল-মন্দ তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবেন।”—সূরা আল মায়দা : ১০৪-১০৫

সাধারণভাবে প্রত্যেক যুগের জাহেল লোকেরা এ ধরনের গোয়রাহীতে ডুবে থাকে এবং আল্লাহর নবীর দাওয়াত কবুল করতে এ জিনিস তাদেরকে বাধা দেয়। হ্যরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন সেই যুগের লোকদেরকে আল্লাহর শরীয়াতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন তখনও তারা একথাই বলেছেনঃ

أَجِئْنَا لِتَلْفِتَنَا عَمًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا ۝ ۷۸ - يونس :

“আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে তুমি কি সেই পথ হতে আমাদেরকে ভুলিয়ে নিতে এসেছো ?”—সূরা ইউনুস : ৭৮

হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন তাঁর গোত্রের লোকদেরকে শির্ক হতে ফিরে থাকতে বললেন, তখন তারাও একথাটি বলেছিলঃ

وَجَدْنَا أَبَاءَنَا لَهَا عِبِيدِينَ ۝ ۵۳ - الأنبياء :

“আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এই দেবতারই পূজা করতে দেখেছি।”

মোটকথা প্রত্যেক নবীরই দাওয়াত তনে সেই যুগের লোকেরা শুধু একথাই বলেছে, “তোমরা যা বলছো তা আমাদের বাপ-দাদার নিয়মের বিপরীত। কাজেই আমরা তা মানতে পারি না।”

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

وَكَذِلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّهُمَا ، إِنَّا

وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أُثْرِهِمْ مُّقْتَنِعُونَ قُلْ أَولَوْ جِئْنَكُمْ بِأَهْدَى
مِنَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاءَكُمْ فَقَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَا مِنْهُ كُفَّرُونَ فَانْتَقَمْنَا
مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ - الزخرف : ۲۵-۲۳

“এ রকম ঘটনা সবসময়ই ঘটে থাকে যে, যখনই কোনো দেশে আমি
নবী পাঠিয়েছি, সেই দেশের অর্থশালী ও সচল অবস্থার লোকেরা তখনই
একথা বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এক নিয়মে চলতে
দেখেছি এবং আমরা ঠিক সেই নিয়মে চলছি। নবী তাদেরকে বললেন,
তোমাদের বাপ-দাদার নিয়ম-পথ অপেক্ষা অধিক ভাল কথা যদি আমি
তোমাদেরকে বলি, তবুও কি তোমরা তাদের নিয়ম অনুসারে চলতে
থাকবে ? তারা উত্তরে বললো, আমরা তোমার কথা একেবারেই মানি
না। তারা যখন এ জবাব দিল তখন আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান
করলাম। আর এখন তোমরা দেখে নাও যে, আমার বিধান অমান্য-
কারীদের পরিণাম কতখানি মারাত্মক হয়েছে।”—সূরা যুখরুফ : ২৩-২৫

এসব কথা প্রকাশ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা হয় বাপ-
দাদারই নিয়ম-পথার অনুসরণ কর, না হয় খাঁটিভাবে কেবল আমারই হৃকুম
মেনে চল ; কিন্তু এ দুটি জিনিস একত্রে ও এক সাথে কখনও পালন করতে
পারবে না। দুটি পথের মধ্যে মাত্র একটি পথ ধরতে পারবে। মুসলমান হতে
চাইলে সবিকিছু পরিত্যাগ করে কেবল আমার হৃকুম পালন করে চলতে থাক :

وَإِنَّا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَإِنَّمَا يُنَزِّلُ مَا يَشَاءُ
أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السُّعَيْرِ ۝ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ
إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَةِ الْوُنْقَىٰ ۝ وَإِلَى اللَّهِ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفَّرُهُ ۝ إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَنَتَبِّعُهُمْ
بِمَا عَمِلُوا ۝ - لقمن : ۲۱-۲۲

“তাদেরকে যখন বলা হলো যে, তোমরা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসরণ
কর ; তখন তারা বলল যে, আমরা তো শুধু সেই পথই অনুসরণ করে
চলবো, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাকে চলতে দেখেছি। কিন্তু শয়তান
যদি তাদেরকে জাহানামের দিকে ডাকে, তবুও কি ? যে ব্যক্তি নিজেকে

পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপার্দ করে দিয়েছে এবং নেককার হয়েছে সে তো মযবুত রশি ধারণ করেছে। কারণ সকল কাজের শেষ আল্লাহর হাতে নিবন্ধ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্থীকার করবে—হে নবী, তার অস্থীকারের জন্য তোমার দৃঢ়থিত হবার কোনো কারণ নেই। তারা সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে। তখন আমি তাদের সকল কাজের পরিণাম ফল দেখিয়ে দেব।”—(সূরা লোকমান ৪ ২১-২৩)

মানুষকে গোমরাহ করার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ। এরপর তৃতীয় পথ সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন আল্লাহর হৃকুম ছেড়ে দিয়ে মানুষের হৃকুম পালন করতে শুরু করে এবং ধারণা করে যে, অমুক ব্যক্তি খুব বড়লোক তার কথা নিশ্চয়ই সত্য হবে, কিংবা অমুক ব্যক্তির হাতে আমার রিয়ক, কাজেই তার হৃকুম অবশ্যই পালন করা উচিত অথবা অমুক ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বেশী, এজন্য তার কথা অনুসরণ করা আবশ্যিক; কিংবা অমুক ব্যক্তি বদ দোয়া করে আমাকে ধৰ্স করে দিবে অথবা অমুক ব্যক্তি আমাকে সাথে নিয়ে বেহেশতে যাবে, কাজেই সে যা বলে তা নির্ভুল মনে করা কর্তব্য অথবা অমুক জাতি আজকাল খুব উন্নতি করছে, কাজেই তাদের নিয়ম অনুসরণ করা উচিত, তখন সে কিছুতেই আল্লাহর হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করতে পারে না।

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ الْأَنْعَامُ ١١٦

“তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করে চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভুলিয়ে ভাস্ত পথে নিয়ে যাবে।”

অর্থাৎ মানুষ সোজা পথে ঠিক তখনই থাকতে পারে যখন তার আল্লাহ কেবলমাত্র একজনই হবে। যে ব্যক্তি শত শত এবং হাজার হাজার লোককে ‘খোদা’ বলে স্বীকার করবে এবং যে ব্যক্তি কখনও এক খোদার কথা মতো আবার কখনও অন্য আর এক খোদার কথা মতো চলবে সে সোজা পথ কখনই পেতে পারে না।

ওপরের আলোচনায় একথা আপনারা ভাল করেই জানতে পেরেছেন যে, মানুষের গোমরাহ হবার তিনটি বড় বড় কারণ বর্তমান :

প্রথম—নফসের দাসত্ত্ব।

দ্বিতীয়—বাপ-দাদা, পরিবার ও বংশের রসম-রেওয়াজের দাসত্ত্ব।

তৃতীয়—সাধারণভাবে দুনিয়ার মানুষের দাসত্ত্ব, ধনী, রাজা, শাসনকর্তা, শত নেতা এবং দুনিয়ার পথচারী জাতিগুলোর দাসত্ত্ব এর মধ্যে গণ্য।

এ তিনটি বড় বড় ‘দেবতা’ মানুষের খোদা হবার দাবী করে বসে আছে। যে ব্যক্তি মুসলমান হতে চায় তাকে সর্বপ্রথম এ তিনটি ‘দেবতাকেই’ অধীকার করতে হবে এবং যখনই সে তা করবে তখনই সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ তিনি প্রকারের দেবতাকে, নিজের মনের মধ্যে বসিয়ে রাখবে এবং এদের হৃকুম মতো কাজ করবে, আল্লাহর প্রকৃত বাস্তু হওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন। সে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়ে, সারাদিন লোক দেখানো রোয়া রেখে এবং মুসলমানের মতো বেশ ধারণ করে লোককে শুধু ধোকাই দিতে পারবে। সে নিজেকেও ধোকা দিতে পারবে যে, সে খাঁটি মুসলমান হয়েছে। কিন্তু এতে কোনোই সঙ্গেই নেই যে, এক্ষেপ কৌশল করে আল্লাহকে কখনও ধোকা দিতে পারবে না।

ওপরে আমি যে তিনটি ‘দেবতা’ উল্লেখ করেছি, এদের দাসত্ব করাই হচ্ছে আসল শিরক। আপনারা পাথরের দেবতা ভাণ্ণিয়েছেন, ইট ও চুনের সমবয়ে গঢ়া মূর্তি ও মূর্তিঘর আপনারা ধ্বংস করেছেন ; কিন্তু আপনাদের বুকের মধ্যে যে মূর্তিঘর বর্তমান রয়েছে, সেই দিকে আপনারা ঘোটেই খেয়াল করেননি। অথচ মুসলমান হওয়ার জন্য এ মূর্তিগুলোকে একেবারে চূর্ণ করে দেয়াই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দরকারী কাজ ও সর্বপ্রথম শর্ত। যদিও আমি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে লক্ষ্য করেই একথা বলছি এবং আমি জানি যে, দুনিয়ার মুসলমান বে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে, এ তিনি প্রকারের দেবতার পূজা করাই হচ্ছে তার একমাত্র কারণ। কিন্তু এখানে আমি কেবল এ দেশীয় মুসলমান ভাইগণকে বলছি যে, আপনাদের অধিপতন আপনাদের নানা প্রকারের অভাব-অভিযোগ ও বিপদের মূল হচ্ছে উপরোক্ত তিনটি জিনিস ; নফসের দাসত্ব, বংশগত প্রথার দাসত্ব এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য মানুষের দাসত্ব আপনাদের মধ্যে এখনও খুব বেশী পরিমাণেই আছে। আর এটাই ভিতর থেকে আপনাদের শক্তি এবং দ্বীন ও ঈমানকে একেবারে নষ্ট করে দিছে। আপনাদের মধ্যে আশরাফ-আতরাফ, কুলীন-গৃহস্ত এবং ছোট লোক বড় লোকের পার্থক্য আছে। আর এরূপে আপনাদের সমাজের লোকদেরকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এ সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে এক জাতি ও পরম্পরের ভাই করে একটি মষবুত দেয়ালের মত করতে চেয়েছিল। সেই দেয়ালের প্রত্যেকখানা ইট অন্য ইটের সাথে মষবুত হয়ে গেঁথে থাকবে, এটাই ছিল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। অথচ আপনারা এখনও সেই পুরাতন হিন্দুয়ানী জাতিদেরের ধারণা নিয়ে রয়েছেন। হিন্দুদের এক গোত্র যেমন অন্য গোত্র হতে পৃথক থাকে আর এক জাতি অন্য জাতিকে ঘৃণা করে আপনারাও ঠিক তাই করছেন। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আপনারা

পরম্পর কোনো কাজ করতে পারেন না। সকল মুসলমানকে আপনারা সমানভাবে ভাই বলে গ্রহণ করতে পারেন না। মুখে মুখে ভাই বলে থাকেন, কিন্তু কাজের বেশায় আপনাদের মধ্যে ঠিক সেরূপ পার্থক্য থেকে যায় যেমন ছিল আরব দেশে ইসলামের পূর্বে। এসব কারণে আপনারা পরম্পর মিলে একটা যথবৃত্ত দেয়াল হতে পারেন না। ভাঙ্গা দেয়ালের নানা দিকে ছড়ানো ইটের মতো আপনারা এক একজন মানুষ পৃথক হয়ে পড়ে রয়েছেন। এ জন্যই না আপনারা এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হতে পারছেন, না কোনো বিপদ-আপদের মুকাবিলা করতে পারছেন। ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা অনুযায়ী আপনাদেরকে যদি বলা যায় যে, এ সমস্ত ভেদাভেদ ও পার্থক্য চূর্ণ করে দিয়ে ও পরম্পর মিলে-মিশে এক হয়ে যান তাহলে আপনারা তখন এই এক কথাই বলবেন যে, আমাদের বাপ-দাদার কাল হতে যে প্রথা ছিল এসেছে তা আমরা ভেঙ্গে দিতে পারি না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে কি বলবেন তা কি আপনারা জানেন? তিনি বলবেন, বেশ তোমরা এ সমস্ত ভেঙ্গ না, আর এ সমস্ত অমুসলমানী আচার ছেড়ো না, ফলে আমিও তোমাদের একেবারে টুকরো টুকরো করে দেব এবং তোমরা দুনিয়ায় বহু লোক ইগ্য সন্ত্রেও আমি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অধিপতিত করে রাখবো।

আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে আদেশ করেছেন, তোমাদের ছেলে-মেয়েরা সকলেই তোমাদের সম্পত্তির অংশ পাবে। কিন্তু আপনারা এর কি উত্তর দিয়েছেন? আপনারা বলেছেন, আমাদের বাপ-দাদার আইনে মেয়েরা সম্পত্তির অংশ পেতে পারে না—পেতে পারে একমাত্র ছেলেরাই। কাজেই আমরা বাপ-দাদার আইন মানি আল্লাহর আইন মানতে পারি না। একটু চিন্তা করে দেখুন, এর নাম কি ইসলাম? আপনাদেরকে বলা হয়েছে যে, বংশগত ও দেশ প্রচলিত আইন পরিত্যাগ কর, উত্তরে আপনাদের প্রত্যেকেই বলে ওঠবেন—সকলে যখন ত্যাগ করবে তখন আমিও করবো। কেননা অন্য লোক যদি তাদের মেয়েকে সম্পত্তির অংশ না দেয়, তাহলে আমার সম্পত্তি তো অন্যের ঘরে চলে যাবে, কিন্তু অন্যের ঘর হতে আমার ঘরে কিছুই আসবে না। ... তেবে দেখুন, এ উত্তরের অর্থ কি? অপরে যদি আল্লাহর আইনের প্রতি ঈমান এনেছেন? তাহলে কাল আপনি এটাও বলতে পারেন যে, অপরে ব্যক্তিচার করলে আমিও ব্যক্তিচার করবো, অপরে চুরি করলে আমিও চুরি করবো। মোটকথা অপরে যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত গোনাহ না ছাড়বে আমিও ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত গোনাহ করতে থাকবো। আসল কথা এই যে, এ ব্যাপারে আমাদের দ্বারা উল্লেখিত তিনটি দেবতারই পূজা করানো হচ্ছে। নফসের বদেগী করছেন,

বাপ-দাদার প্রথারও বন্দেগী করছেন, আর দুনিয়ার মুশরিক জাতিগুলোর দাসত্বও আপনারা করছেন। অথচ এ তিনটি দেবতার পূজার সাথে সাথে ইসলামের দাবীও আপনারা করছেন। এখানে মাত্র দু'টি উদাহরণ আমি উল্লেখ করলাম। নতুবা একটু চোখ খুলে তাকালে এত প্রকারের বড় বড় রোগ আপনাদের মধ্যে দেখা যাবে যে, তা শুণেও শেষ করা যাবে না এবং লক্ষ্য করলে আপনি দেখবেন যে, কোথাও একটি দেবতার পূজা চলছে, কোথাও দু'টি দেবতার পূজা চলছে। অপর কোথাও তিনটি দেবতারই পূজা চলছে। তিনটি দেবতার পূজা করার সাথে সাথে ইসলামেরও দাবী করা একটা হাস্যকর ব্যাপার এবং এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা খাঁটি মুসলমানদের ওপর যে অফুরন্ত রহমত নায়িল করার ওয়াদা করেছেন, ঠিক তাই আমাদের ওপর নায়িল হবে—এক্ষেপ আশা করাও কম হাস্যকর ব্যাপার নয়।

ঈমানের পরীক্ষা

পূর্বের প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, কুরআনের মতে মানুষের শুমরাহ হবার আসল কারণ হচ্ছে তিনটি। প্রথম, আল্লাহর আইন ত্যাগ করে নিজের নফসের আহেশাতের গোলাম হওয়া ; দ্বিতীয়, আল্লাহর আইনের মোকাবিলায় নিজের বৎশের রসম-রেওয়াজ ও বাপ-দাদার পথ অনুসরণ করা এবং তৃতীয়, আল্লাহ ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পথনির্দেশ করেছেন, তাকে দূরে নিষ্কেপ করে দুনিয়ার মানুষের আনুগত্য করা—সেই মানুষ তার নিজের জাতির প্রতিপত্তিশালী লোক হোক, কিংবা ভিন্ন জাতিরই হোক।

মুসলমানের খাঁটি পরিচয় এই যে, সে এ তিনি প্রকারের রোগ ও গোমরাহী হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। মুসলমান শুধু তাকেই বলে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস নয় এবং রাসূল ছাড়া অন্য কারো অনুসরণ করে না। সেই ব্যক্তি মুসলমান, যে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর নবীর শিক্ষাই সম্পূর্ণ সত্য, এর বিপরীত যা, তা সবই ঝিথ্যা। মানুষের দীন-দুনিয়ার মংগল ও উন্নতি কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের মহান শিক্ষার ভেতরেই নিহিত আছে। একথা যে ব্যক্তি নিসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারবে, সে তার জীবনের প্রত্যেক কাজেই কেবল অনুসন্ধান করবে আল্লাহর হৃকুম কি, রাসূলের বিধান কি ? আর যখনই তা সে জানতে পারবে তখনই সে সোজাসুজি এর সামনে তার মাথা নত করে দেবে। অতপর তার মন যতই অস্ত্রিত হোক না কেন, তার বৎশের লোক তাকে ফিরাতে যতই চেষ্টা করুক না কেন এবং দুনিয়ার লোক তার যতই বিরোধিতা করুক না কেন, সে তাদের কারো পরোয়া করবে না। কারণ সে প্রত্যেককেই এই একমাত্র জবাব দিবে, ‘বাঃ আমি তো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই বান্দাহ—তোমাদের কারো বান্দাহ নই আর আমি রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি—তোমার ওপর ঈমান আনিনি।’ কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ ও রাসূলের যদি এটা হৃকুম হয়ে থাকে তবেই হোক না, আমার অন্তর তা মানে না ; অথবা তাতে আমার ক্ষতি হবার আশংকা আছে ; কাজেই আমি আল্লাহ ও রাসূলের হৃকুম ছেড়ে আমার নিজের মতে চলবো — তাহলে এমন ব্যক্তির মনে ঈমানের নাম গঞ্জও অবশিষ্ট থাকবে না। সে মুঁয়িন নয়—বরং মুনাফিক ; মুখে মুখে যদিও সে কেবল আল্লাহর বান্দাহ ও নবীর অনুসরণকারী হবার দাবী করে ; কিন্তু আসলে সে নিজের নফসের বান্দাহ আর তার নিজের মতেরই অনুসরণকারী।

অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, আল্লাহ ও রাসূলের হৃকুম যাই হোক না কেন ; কিন্তু অমুক নিয়ম যেহেতু বাপ-দাদার কাল হতে চলে এসেছে,

সুতরাং তাকে কেমন করে ছাড়া যায় ? অথবা অমুক নিয়ম তো আমার বংশ বা গোত্রে আবহামানকাল হতে চলে এসেছে, আজ আমি এর বিপরীত কেমন করে করবো ? তাহলে এমন ব্যক্তিকেও ঐ মুনাফিকের দলে গণ্য করতে হবে। নামায পড়তে পড়তে তার কপালে যতই দাগ পড়ুক না কেন, আর প্রকাশ্যে সে যতই ধার্মিকের বেশ ধারণ করে থাকুক না কেন ; কিন্তু আসলে সে একজন মুনাফিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ এই যে, ধর্মের মূল তত্ত্ব তার মনে ঘোটেই স্থান পায়নি—তার মন খাঁটিবাবে ইসলামকে কবুল করে না। শুধু কুরুক'-সিজদাহ বা রোষা ও হজকে 'দীন ইসলাম' বলা হয় না। আর মানুষের বাস্তিক বেশকে মুসলমানের মত করে নিলে 'দীন' পালন করা হয় না। বরং আসলে 'দীন' বা ধর্ম বলা হয় আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করাকে। যে ব্যক্তি নিজের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে অঙ্গীকার করে তার মনে প্রকৃতপক্ষে 'দীন'-এর নাম গন্ধ ও বর্তমান নেই। তার নামায, রোষা এবং তার পরহেয়গারী ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনুরূপভাবে কোনো মানুষ যদি আল্লাহ এবং তাঁর নবীর হেদায়াতের প্রতি বেপরোয়া হয়ে বলে যে, যেহেতু ইউরোপীয় বা আমেরিকান জাতির মধ্যে অমুক জিনিসের খুব প্রচলন আছে এবং তারা উন্নতি লাভ করেছে, অতএব তা আমাদেরও গ্রহণ করা উচিত ; কিংবা অমুক জাতি অমুক কাজ করেছে, অমুক বড় গ্লোক একথা বলেছেন, কাজেই তা আমাদেরও পালন করা কর্তব্য, তাহলে এমন ব্যক্তির দ্রুতান আছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। দ্রুতান থাকলে এসব কথা কেউ বলতে পারে না। বাস্তবিকই যদি মুসলমান হয়ে থাকেন এবং মুসলমানই থাকতে চান, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হকুমের বিপরীত যে কথাই হবে তাই দুরে রিক্ষেপ করতে হবে। এরপ করতে না পুরলে ইসলামের দাবী করা কারো পক্ষে শোভা পায় না। 'আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করি' বলে যখে দাবী করা আর জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারে সরসময়ই আল্লাহ ও রাসূলের কথাকে বাদ দিয়ে দুনিয়ার লোকদেরকে অনুসরণ করা—এটা না হিয়ান না ইসলাম, এর নাম মুনাফিকী ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

পরিত্র কুরআনের ১৮শ পার্শ্ব পার্শ্ব আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْتِ مُبِينٍ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
وَيَقُولُونَ أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ۝ مَمْ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مَنْ بَعْدَ
ذَلِكَ ۝ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ
2—

بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَإِنْ يُكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ
مُّذْعِتِينَ ۝ أَفَيْ قُلُوبُهُمْ مُّرَضٌ أَمْ أَرْتَابُهُمْ أَمْ يَخافُونَ أَنْ يُحِيفَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۝ بَلْ أُولَئِنَّكُمُ الظَّالِمُونَ ۝ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُقْرِبِينَ
إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا
أُولَئِنَّكُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ فَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِيَ
فَأُولَئِنَّكُمُ الْفَانِيُّونَ ۝ - النور : ۵۲-۶

“আমি হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী আয়াতসমূহ নায়িল
করে দিয়েছি। আল্লাহ যাকে চান এ আয়াতের সাহায্যে তাকে সোজা পথ
দেখিয়ে দেন। লোকেরা বলে আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান
এনেছি এবং আমরা (তাঁদের) আনুগত্য স্বীকার করছি; কিন্তু পরে তাঁদের
মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক আনুগত্য করা ছেড়ে দেয়। এ শ্রেণীর
লোকেরা ইমানদার নয়। তাঁদের কাজ-কারিগারের ব্যাপারে আল্লাহ
তাঁদের আইন অনুসারে ফায়সালা করার জন্য যখন তাঁদেরকে ডাকা হয়
তখন কিছু লোক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। কিন্তু আল্লাহর
আইনের ফায়সালা যদি তাঁদের মনের মত হয় তবে অবশ্য তা স্বীকার
করে নেয়। তাঁদের মনের মধ্যে কি রোগ আছে? না তাঁরা তখন অকারণ
সন্দেহের মধ্যে ভুবে রয়েছে? অথবা তাঁদের এ যে আছে যে, আল্লাহ এবং
তাঁর রাসূল তাঁদের ‘হক’ নষ্ট করবেন? কারণ যাই হোক, তাঁরা নিজেরাই
নিজেদের ওপর যুশুম করছে। প্রত্যেক ইমানদার লোকের নির্ম এই যে,
আল্লাহর আইন অনুসারে বিচার করার জন্য যখন তাঁদেরকে ডাকা হয়
তখন তাঁরা ‘আমরা শুনেছি এবং তা অনুসরণ করি’ বলে মাথা নত করে
দেয়। বাস্তবিক পক্ষে এ শ্রেণীর লোকেরাই মুক্তি ও উন্নতি লাভ করতে
পারে। আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হকুম পালন করবে, আল্লাহকে
ভয় করবে এবং তাঁর নাকরমানী হতে ফিরে থাকবে কেবল তাঁরাই
সফলকাম হবে এবং মুক্তি পাবে।”—সূরা আল নূর : ৪৬-৫২

এ আয়াতসমূহে ইমানের যে পরিচয় দেয়া হয়েছে আপনারা তা একটু
বিশেষভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। বস্তুত নিজেকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের
হেদায়াতের সামনে সোপর্দ করে দেয়ার নামই হচ্ছে ইমান। সেখান হতে যে
হকুম আসে তার সামনে মাথা নত করে দাও। এর বিরোধী কোনো কথা তলবে

না—না নিজের মনের কথা, না বংশ ও পরিবারের কথা আর না দুনিয়ার লোকদের কথা। যে ব্যক্তির মনের মধ্যে এ শুণ বর্তমান থাকবে প্রকৃতপক্ষে সেই হবে মুমিন ও মুসলমান। আর যার মধ্যে এ শুণ থাকবে না তাকে মুনাফিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

আপনারা হয়তো জনেছেন যে, আরব দেশে মদ পান করার প্রথা খুব বেশী প্রচলিত ছিল। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃন্দ সকলেই মনের জন্য একেবারে পাগল প্রায় ছিল। আসলে মনের প্রতি তাদের অন্তরে গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান ছিল। এর প্রশংসা করে কত যে গহল-গীত তারা রচনা করেছিল, তার হিসেব নেই। মনের জন্য প্রাণ দিতেও তারা প্রস্তুত হতো। একথাও আপনারা জানেন যে, একবার মনের নেশা লাগলে তা দূর হওয়া বড়ই মুশকিল। মনখোর ব্যক্তিরা মনের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু মদ ত্যাগ করতে পারে না। কোনো মনখোর যদি মদ না পায় তবে তার অবস্থা কঠিন রোগীর অপেক্ষাও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু যখন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়ত নাযিলু হয়েছিল তখন কি অবস্থা হয়েছিল তা কি আপনারা কখনও জনেছেন? মনের জন্য পাগল জান দিতে প্রস্তুত সেই আরবরাই এ হকুম পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের হাতেই মনের বড় বড় পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছিল। মদীনার অলিতে-গলিতে বৃষ্টির পানির মত মদ বরে শিরেছিল। একটি মজলিসে কয়েকজন লোক একত্রে বসে মদ পান করেছিল। হ্যারতের ঘোষণাকারী যখন তাদের কাছাকাছি শিরে বললো যে, মদ নিষিদ্ধ হয়েছে, তখন যার হাত যেখানে ছিল তা সেখানেই খেমে গেল আর একটুও কেউ অহসর হলো না। যার হাতের পেঁয়াজা মুখের সাথে লেগেছিল, সে তখনই তা সরিয়ে নিলো। তারপর আর এক বিন্দু মদ তার উদরে প্রবেশ করতে পারেনি। এটাই হচ্ছে সত্যিকার ঈমানের পরিচয়। আর এটাকেই বলা হয় আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য।

ইসলামে ব্যক্তিগত শান্তি কত কঠিন তা তো আপনাদের অজ্ঞানা নয়। তা হচ্ছে পিঠে একশত চাবুক। বস্তুত এর কঢ়না করলেও মানুষের শরীর শিউরে ওঠে। আর ব্যক্তিগত বিবাহিত হলে তো তাকে একেবারে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। এ কঠিন শান্তির নাম তনলেই মানুষ তয়ে কেঁপে ওঠে। কিন্তু যেসব লোকের খাঁটি ঈমান ছিল, অর্থচ ভুলবশত তাদের ঘারা কোনো ব্যক্তিগতের কাজ হয়ে শিরেছিল, তাদের অবস্থা কিন্তু প্রিপ ছিল, তা কি আপনারা জানেন? একজন লোক শয়তানের প্রতারণায় পড়ে ব্যক্তিগত করে বসলো। তার সাক্ষী কেউ ছিল না, আদালতে ধরে নিয়ে বাবারও কেউ ছিল না, পুলিশকে খবর দেয়ার মতো লোকও কেউ ছিল না। কিন্তু তার মনের মধ্যে ছিল খাঁটি ঈমান। আর সেই ঈমান তাঁকে বললো—আল্লাহর আইনকে ভয় না

করে যখন তুমি নফসের খাহেশ পূর্ণ করেছ তখন তাঁর নির্দিষ্ট আইন মতে শাস্তি নিবার জন্য প্রস্তুত হও। কাজেই সে নিজেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে হায়ির হলো এবং নিবেদন করলো : ‘হে আল্লাহর রাসূল ! আমি ব্যভিচার করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন ।’ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সেই ব্যক্তি আবার সেই দিকে গিয়ে শাস্তি দেয়ার জন্য অনুরোধ করলো এবং বললো, আমি যে পাপ করেছি আমাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিন । এটাকেই বলে ঈমান। এ ঈমান যার মধ্যে বর্তমান থাকবে, খোলা পিঠে একশত চাবুকের ঘা নেয়া এমন কি পাথরের আঘাত খেয়ে মরে যাওয়াও তার পক্ষে সহজ ; কিন্তু আল্লাহর নাফরমানী করে আল্লাহর সামনে হায়ির হওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন ব্যাপার ।

আপনারা এটাও জানেন যে, দুনিয়ার মানুষের কাছে তার আজীয়-স্বজনই অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে। বিশেষ করে পিতা-পুত্র-ভাই মানুষের এত প্রিয় যে, তাদের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতেও মানুষ প্রস্তুত হয়। কিন্তু আপনি একবার বদর ও ওহোদের যুদ্ধের কথা চিন্তা করে দেখুন যে, তাতে কে কার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বাপ মুসলমানদের দলে, ছেলে কাফেরদের দলে, ছেলে একদিকে, পিতা অন্যদিকে, এক ভাই ইসলামের পক্ষে অন্য ভাই দুশমনের পক্ষে। একেবারে নিকটতম আজীয়গণ দু’ দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, যেন তারা কেউ কাউকে চিনেই না। কোনো টাকা পয়সা কিংবা জ্বালানী জমি অথবা কোনো ব্যক্তিগত শক্তার জন্য তারা যুদ্ধ করেনি। তারা নিজেদের রক্ত দান করে আজীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে শুধু আল্লাহ ও রাসূলের খান্ডিতেই যুদ্ধ করেছে। আর আল্লাহ ও রাসূলের জন্য বাপ-ভাই-ছেলে এবং বংশের সকলেকেই অকাতরে কুরবান করার মতো প্রচণ্ড মনোবল তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল ।

আপনাদের একথাও জানা আছে যে, ইসলাম আরব দেশের প্রায় প্রাচীন রসম-রেওয়াজকে একেবারে বক্ষ করে দিয়েছিল। তখনকার যুগে সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান ছিল মৃত্যি পূজা। এ প্রথা শত শত বছর ধরে চলে আসছিল। কিন্তু ইসলাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলো, এ মৃত্যিগুলো পরিত্যাগ কর। মদ পান, ব্যভিচার, জুয়া, চুরি, ডাকাতি আরব দেশের নিত্যকার ঘটনা ছিল। ইসলাম বললো, এসব ছাড়তে হবে। আরব দেশের নারীরা একেবারে খোলাখুলিভাবে চলাফিরা করতো। ইসলাম আদেশ করলো, এরূপ চলতে পারবে না পর্দাৰ ব্যবস্থা কর। মেয়েদেরকে সেখানে সম্পত্তির অংশ দেয়া হতো না। ইসলাম

যোষণা করলো, পুরুষদের মতো মেয়েরাও সম্পত্তির অংশ পাবে। পালিত পুত্রকে সেখানে ঠিক আপন ঔরষজাত পুত্রের মতো মনে করা হতো। ইসলাম বললো, এটা হতে পারে না। পরের ছেলে পালন করলেই একেবারে নিজের ঔরষজাত সন্তানের মতো হয়ে যায় না। এমনকি পালিত পুত্র তার ঝীকে তালাক দিলে তাকে বিয়েও করা যেতে পারে। মোটকথা, এ সমস্ত পুরাতন রসমকে সেখানে একটি একটি করে চুরমার করে দেয়া হয়েছিল।

যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছিল, তখন তারা কিভাবে কাজ করেছিল তা কি আপনারা জানেন? শত শত বছর ধরে যেসব মূর্তিকে তারা এবং তাদের বাপ-দাদারা পূজা করেছে, যেসবের সামনে নানা প্রকারের ভেট ও ভোগ হাফির করেছে এবং যেগুলোর সামনে মাথা ঠেকিয়ে সিজদা করেছে, ঈমানদার ব্যক্তিগণ তা নিজেদেরই হাতে এক একটা করে চূর্ণ করে ফেলেছে। শত শত বছর ধরে যেসব বংশীয় রীতিনীতি ও রসম-রেওয়ায় চলে আসছিল তা সবই তারা পরিত্যাগ করেছিল; যেসব জিনিসকে তারা মহান ও পবিত্র বলে ধারণা করতো, আল্লাহর হৃকুম পেয়েই তারা তাকে পায়ের তলে দলিত করলো। যেসব জিনিস তারা ঘৃণা করতো আল্লাহর হৃকুম পাওয়া মাত্রই তাকে তাল মনে করে গ্রহণ করতে লাগলো। চিরকাল যেসব জিনিসকে পাক ও পবিত্র মনে করা হতো, আল্লাহর বিধান মতো সেই সবকে অপবিত্র মনে করতে শুরু করলো। আর যেসব জিনিসকে অপবিত্র মনে করতো, সহসা তা পবিত্র হয়ে গেল। যেসব কাফেরী চালচলনে তারা আরাম ও সুখ মনে করতো, আল্লাহর হৃকুম পাওয়া মাত্রই তা সবই ছেড়ে দিয়েছিল এবং ইসলামের যেসব হৃকুম পালন করা মানুষের পক্ষে কষ্টকর বলে মনে হতো তারা সেইসবকে সানন্দে কবুল করে নিলো। এরই নাম ঈমান এবং একেই বলা হয় ইসলাম। কিন্তু ভেবে দেখুন, আরব দেশের লোকেরা যদি তখন তাদের বাপ-দাদাদের মতো বলতো, অযুক অযুক কাজ আমরা মানব না, কারণ এতে আমাদের ক্ষতি হবে—অযুক কাজ আমরা নিশ্চয় করবো কারণ বাপ-দাদার কাল হতেই এটা চলে এসেছে এবং রোম দেশের লোকদের কিংবা ইরান দেশের লোকদের অযুক কাজ আমাদের খুব ভালো লাগে বলে তা আমরা ছাড়তে পারবো না। এরপে ইসলামের এক একটা হৃকুম বাতিল করে দিতো তাহলে দুনিয়ায় এখন একজন মুসলমানও থাকতো কি?

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

لَنْ تَنَأِلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۔ - الْعِمَرَانَ : ٩٢

“তোমাদের প্রিয় জিনিসগুলোকে যদি তোমরা আল্লাহর জন্য কুরবানী না কর তাহলে তোমরা প্রকৃত কল্যাণ কিছুতেই লাভ করতে পারবে না।”

-সুরা আলে ইমরান : ১২

এ আয়াতটিই ইসলাম ও ইমানের মূল কথা। ইসলামের আসল দাবী হচ্ছে, তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দাও। জীবনের সব রকমের কাজ-কারিবারেই আপনারা দেখতে পাবেন যে, আল্লাহর হকুম একদিকে আপনাকে ডাকে, আর আপনাদের নফস ডাকে এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। আল্লাহ এক কাজের হকুম করেন অথচ আপনার নফস সে কাজে আপনার ভয়ানক কষ্ট কিংবা শ্রতি হবে বলে প্ররোচিত করে। আল্লাহ এক কাজ করতে নিষেধ করেন, কিন্তু আপনার নফস তাকে অভ্যন্তর মজাদার উপকারী জিনিস মনে করে তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না। প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে একদিকে আর সারা দুনিয়ার সুখ-সুবিধার আকর্ষণ আপনাকে ডাকতে থাকে সম্পূর্ণ অন্যদিকে। মোটকথা জীবনের প্রত্যেক পদেই মানুষের সামনে দৃঢ়ি পথ এসে পড়ে; একটি ইসলামের পথ, অপরটি কুফর ও মূলাফিকীর পথ। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসকে পদাঘাত করে একমাত্র আল্লাহর হকুমের সামনে মাথা নত করে দেবে, মনে করতে হবে যে, কেবল সেই ব্যক্তিই ইসলামের পথ ধরেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হকুমের ওপর পদাঘাত করে নিজের মনের বা দুনিয়ার খুশী চরিতার্থ করবে, বুঝতে হবে যে, সে কাফেরী এবং মূলাফিকীর পথ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান কালের মানুষ সম্পূর্ণ সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করেছে। তারা ইসলামের সরল নিয়মগুলো তো অত্যন্ত আনন্দের সাথে স্বীকার করে, কিন্তু কুফর ও ইসলামের প্রকৃত মোকাবিলার সময় নিজেদের গতি পরিবর্তন করে ফেলে। ইসলামের বড় বড় দাবীদার লোকদের মধ্যেও এ রকম দুর্বলতা রয়েছে। ইসলাম ! ইসলাম ! করে তারা চীৎকার তো খুবই করে, ইসলামের তা'রীফ করতে গিয়েও তাদের মুখে বৈধ ফোটে আর সে জন্য লোক দেখানো কাজও তারা যথেষ্ট করে, কিন্তু যে ইসলামের তারা এত তা'রীফ করে থাকে, সকলে মিলিত হয়ে সেই ইসলামের পরিপূর্ণ বিধানকে নিজেদের ওপর জারী করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানালে তারা অমনি বলে উঠে : এ কাজ সহজ নয়, এতে নানা প্রকারের কষ্ট আছে কিংবা এখন তা হতে পারে না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইসলাম একটা সুন্দর খেলনা মাত্র। তাকে তাকের ওপর উঠিয়ে রেখে দিলে এর সৌন্দর্য দেখা যায়। মুখে এর খুবই তা'রীফ করা যেতে পারে, কিন্তু নিজের ও পরিবারের লোকজনের ওপর, আজ্ঞান-বজ্জনের ওপর,

নিজেদের কাজ-কারবারের ওপর তাকে একটা পরিপূর্ণ আইন হিসেবে জারী করার নাম নেয়া তাদের মতে একটা অপরাধ। আমাদের আজকালকার ধার্মিক বলে পরিচিত ব্যক্তিদের অবস্থা হয়েছে এই—তারপর দুনিয়ার অন্য লোকদের কথা আর কি বলা যায়? মনে রাখবেন, ঠিক এ কারণেই আজ আমাদের নামায, গোষ্ঠী, কুরআন তেলোওয়াত ও শরীয়াতের প্রকাশ্য অনুসরণের মধ্যে পূর্বের সেই প্রভাব আ? বর্তমান নেই এবং সে জন্যই তাতে আমরা বাস্তব জীবনে কোনো ফলই লাভ করতে পারছি না। কারণ প্রাণটাই যখন না থাকে, তখন প্রাণহীন দেহটা আর কি সৃফল দেখাতে পারে?

ইসলামের নিভূল মানদণ্ড

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিভাবে বলেছেন :

قُلْ إِنَّ هُنَّ لَتَّيْ وَنَسْكُنْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ فَيَذْلِكَ أَمْرٌ ۖ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ - الانعام : ۱۶۴-۱۶۳

“(হে মুহাম্মাদ !) বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদাত অনুষ্ঠান এবং আমার জীবন ও মৃত্যু—সবকিছুই আল্লাহর জন্য ; যিনি সারাজাহানের মালিক ও প্রভু। তাঁর কেউ শরীক নেই। এরূপ বলার জন্যই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর সর্বপ্রথম আমি তাঁরই সামনে আনুগত্যের মন্তক নত করে দিচ্ছি।”—সূরা আল আনআম : ১৬৩-১৬৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنْعَلَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ -

“আল্লাহর জন্য যে ভালবাসলো, আল্লাহরই জন্য যে দুশ্মনী করলো, আল্লাহরই জন্য যে দান করলো এবং আল্লাহরই জন্য দেয়া বক্ষ করলো, সে তার ঈমানকে পূর্ণ করলো। অর্থাৎ সে কামিল ঈমানদার হলো।”

প্রথমে আমি যে আয়াতের উল্লেখ করেছি তা হতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানুষকে তার সমস্ত দাসত্ব-আনুগত্যের এবং নিজের জীবন ও মৃত্যুকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিষ্ঠা সহকারে উৎসর্গ করার এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিচ্ছে। অন্য কথায় মানুষ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করবে না। তার জীবন-মৃত্যুও আল্লাহ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হবে না।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় যা পেশ করা হয়েছে তাতে জানতে পারা যায় যে, মানুষের ভালবাসা, শক্রতা এবং নিজের বৈষম্যিক জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার ও লেন-দেন একান্তভাবে আল্লাহরই জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়া মূল ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। তা না হলে উচ্চর্ম্মাদা লাভ তো দূরের কথা ঈমানই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ ব্যাপারে যতটুকু অপূর্ণতা থাকবে মানুষের ঈমানের ঠিক ততটুকুই অপূর্ণতা থেকে যাবে। পক্ষান্তরে এদিক দিয়ে মানুষ যত পূর্ণতা সহকারে আল্লাহর কাছে সমর্পিত চিত্ত হতে পারবে তার ঈমানও ততটুকুই পূর্ণ হবে।

অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, নিজেকে সর্বোত্তমাবে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেয়া শুধু উচ্চ মরতবা বা মর্যাদা লাভের জন্যই প্রয়োজন, শুধু ইমান ও ইসলামের জন্য কারোও মধ্যে এতদূর উন্নতভাবের সৃষ্টি হওয়া কোনো জরুরী শর্ত নয়। অন্য কথায় তাদের ধারণা এই যে, উচ্চ রূপ ভাবধারার সৃষ্টি না হলেও মানুষ ইমানদার, মুসলমান হতে পারে। কিন্তু এরপ ধারণা মূলের দিক দিয়েই ভুল আর সাধারণ মানুষ আইনগত ইসলাম ও আল্লাহর কাছে গণ্য প্রকৃত ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না বলেই এরপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

ফিকাহ সম্মত ও আইনগত ইসলামে মানুষের মনের প্রকৃত অবস্থা দেখা হয় না—আর তা দেখা সম্ভবও নয়। বরং মানুষের মৌখিক স্বীকৃতির ধাতব প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি জরুরী বাহ্যিক নির্দর্শন বর্তমান থাকার ওপরই লক্ষ্য আরোপ করা হয়। কেউ যদি মুখে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, পরিকাল ও অন্যান্য জরুরী বিষয়ে ইমান রয়েছে বলে স্বীকার করে অতপর এ মৌখিক স্বীকারোক্তির বাস্তব প্রমাণের জরুরী শর্তগুলো পূরণ করে তবে তাকে ইসলামের সীমার মধ্যে গণ্য করা হবে। তাকে মুসলমান মনে করেই তার সাথে সকল কাজ-কর্ম করা হবে। কিন্তু মূলত এসব বিষয়ই শুধু এ দুনিয়ার জন্য সীমাবদ্ধ এবং এটাতে শুধু বৈষয়িক দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ও তমুদুনিক ভিত্তিই লাভ হয়ে থাকে। এরপ স্বীকারোক্তির সাহায্যে যারা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করবে তারা সকলেই মুসলিম বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে কাউকে কাফের বলা যাবে না। তারা পরম্পরের কাছ হতে শরীয়াত সম্মত নেতৃত্ব ও সামাজিক অধিকার লাভ করবে, তাদের পরম্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারবে, মীরাস বস্তন হবে এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

কিন্তু পরিকালে মানুষের মুক্তি লাভ, তার মুসলিম ও মু'মিন রূপে গণ্য হওয়া এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের মধ্যে শামিল হওয়া কেবলমাত্র উচ্চ রূপ আইনগত ও মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা সম্ভব নয়, বরং মানুষের মনে স্বীকৃতি আল্লাহর দিকে অন্তরকে সমাহিত করা এবং ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেয়াই এর জন্য অপরিহার্য শর্ত। পৃথিবীতে মৌখিক স্বীকৃতির মূল্য হয় শুধু কায়ীর দরবারে ও সাধারণ মানুষ বা মুসলমানদের মধ্যে; কেননা তারা কেবল বাহিরকেই দেখতে পারে। কিন্তু আল্লাহ দেখেন মানুষের মন বা অন্তরকে—তার ভিতরকার আসল অবস্থা ও ভাবধারাকে। আল্লাহ মানুষের ঈমানের পরিমাপ করেন। মানুষ তার

জীবন ও মৃত্যুকে তার যাবতীয় কৃতজ্ঞতা, বক্তৃতা, আনুগত্য, দাসত্ব ও গোটা জীবনের কর্মধারাকে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছে, না অপর কারোও জন্য, আল্লাহর দরবারে ঠিক এ মাপকাঠিই মানুষকে যাচাই করা হবে। এ যাচাইয়ের ফলে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে এসব কিছু একমাত্র আল্লাহরই জন্য উৎসর্গ করেছিল তবে সে মুসলিম এবং মু'মিন বলে গণ্য হবে, আর অন্য কারোও জন্য উৎসর্গ করে থাকলে সে না মুসলিমরূপে গণ্য হবে, না মু'মিনরূপে। এ দৃষ্টিতে যে যতদূর কাঁচা ও অপরিপক্ষ প্রমাণিত হবে তার ইমান এবং ইসলামও ঠিক ততদূরই অপরিপক্ষ হবে। দুনিয়ায় সে অতিবড় মুসলিমরূপে গণ্য হলেও এবং সেখানে তাকে অতুল্য মর্যাদা দান করা হলেও আল্লাহর দরবারে তার কোনোই শুরুত্ব হবে না। আল্লাহ যা কিছু আপনাকে দিয়েছেন, আপনি তার সবকিছুই আল্লাহর জন্য—আল্লাহরই নির্দেশিত পথে প্রয়োগ করলেন কি না শুধু এ দিক দিয়েই আল্লাহর কাছে মানুষের মূল্য হ্তির হবে। আপনি একলপ করে থাকলে আপনাকে ঠিক অনুগত ও বক্তৃত্বের প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া হবে। আর কোনো জিনিস যদি আপনি আল্লাহর বন্দেগী হতে দূরে রাখেন, আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রয়োগ না করেন তবে আপনার মুসলিম দাবী করার—অর্ধাং নিজেকে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করার মৌখিক উক্তি একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং এ মিথ্যা উক্তি দ্বারা দুনিয়ার লোকদেরকে ধোকা দেয়া সম্ভব হলেও হতে পারে; তারা আপনার এ মৌখিক উক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে আপনাকে স্থান দিতে এবং মুসলিম হিসেবে সকল সুযোগ-সুবিধা দান করতেও পারে। কিন্তু আল্লাহ কখনও তাতে প্রতারিত হবেন না এবং আপনাকে তাঁর বিশ্বাস ও অনুগত বক্তৃদের মধ্যে গণ্য করবেন না।

আইনগত ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের এ পার্থক্যের যে ব্যাখ্যা দান করা হলো, তা গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায় যে, এর ফলাফল কেবল পরকালেই ভিন্ন ভিন্ন হবে না; বরং দুনিয়ায়ও এ পার্থক্যের বাস্তব ফল ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য। এজন্য দুনিয়ায় যত মুসলমান এসেছে এবং যত মুসলমান এখন দুনিয়ায় রয়েছে তাদের সকলকে উপরোক্ত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

এক ধরনের মুসলমান দেখা যায় যারা আল্লাহ ও রাসূলকে স্বীকার করে ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম হিসেবে মেনে নেয়; কিন্তু এ ধর্ম নিজেদের সামগ্রিক জীবনের শুধু একটি অংশ বা একটি বিভাগের মর্যাদাই দেয়—তার অধিক নয়। ফলে এ বিশেষ অংশ ও বিভাগে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস পূর্ণ মাত্রায় স্থাপন করা হয়। ইবাদাত-বন্দেগীর অনুষ্ঠানসমূহ যথারীতি পালন করা

হয়। তাসবীহ পাঠ ও যিকির-আয়কার করা হয়। পানাহার ও কোনো কোনো সামাজিক ব্যাপারে পরহেষগারীও অবলম্বন করা হয়; ধর্ম পালন বলতে যা করণীয় তা প্রায় সবই করা হয়। কিন্তু এ অংশ ও বিভাগ ছাড়া জীবনের অন্যান্য দিকে ও বিভাগে মুসলিমানী কাজসমূহ করার কোনো সুযোগই দেয়া হয় না; সেখানে ভালবাসা হলে তা হয় নিজের প্রতি, নিজ স্বার্থের প্রতি, দেশ ও জাতি কিংবা অন্য কোনো জিনিসের প্রতি আর দুশ্মনী বা যুদ্ধ করলেও তা করা হয় অনুরূপ কোনো বৈষম্যিক স্বার্থের জন্য। তাদের লেন-দেন, তাদের কাজ-কারবার, সম্পর্ক-সরক্ষ, তাদের সন্তান-সন্ততি, বৎস-পরিবার, দেশ ও সমাজ এবং অন্যান্য লোকের সাথে ব্যবহার ইত্যাদি সবই হয়ে থাকে ধীন ইসলামকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নিষ্কর্ষ বৈষম্যিক দৃষ্টিতে। জমিদার, ব্যবসায়ী, শাসনকর্তা, সৈনিক যে যাই হোক না কেন, প্রত্যেকেই একজন স্বাধীন পেশাদার হিসেবে কাজ করে, মুসলিমান হিসেবে নয়। এ দিক দিয়ে মুসলিমানীকে বিনুমাত্র হান দেয় না। তারা খিলিত ও সমষ্টিগতভাবে যে তমুচ্চনিক, শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করে তার ওপর তাদের মুসলিমানীর আংশিক প্রভাব পড়লেও তার সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার মুসলিমান দেখা যায়, যারা নিজেদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বে, নিজেদের সমগ্র সন্তাকে ইসলামের কাছে সোপন্দ করে দেয়। তাদের জীবনের সমগ্র দিকেই তারা মুসলিমরূপে কর্তব্য সম্পাদন করে। তারা হয় মুসলিম পিতা, মুসলিম সন্তান, মুসলিম স্ত্রী, ব্যবসায়ী, জমির মালিক, মজুর, চাকর — যাই হোক না কেন, সর্বত্র মুসলিম হিসেবেই তাদের জীবন চালিত হয়, তাদের ঘনের ভাবধারা, আশা-আকাংখা, চিন্তা ও মতবাদ, তাদের রায় ও সিদ্ধান্ত, তাদের ঘৃণা ও ভালবাসা তাদের পসন্দ অপসন্দ সবকিছুই ইসলামী আদর্শের অনুসারেই হবে। তাদের মন ও মগ্ন্যের ওপর তাদের চোখ ও কানের ওপর, তাদের উদর ও লজ্জাহানের ওপর, তাদের হাত-পা ও দেহের যাবতীয় অংগ-প্রত্যঙ্গের ওপর সম্পূর্ণ রূপে ইসলামের আধিপত্য বিরাজ করবে। তাদের মেহ ভালবাসা বা শক্তি ইসলামের সীমালংঘন করবে না। কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলে ইসলামের অন্যাই করবে, কারো সাথে লড়াই করলে ইসলামেরই অন্য লড়াই করবে, কাউকে কিছু দান করলে শুধু এ জন্যাই দান করবে যে, একপ দান করা ইসলামের নির্দেশ। পক্ষান্তরে কাউকে কিছু দেয়া বক্ষ করলে তা ঠিক ইসলামের নির্দেশ অনুসারে বক্ষ করবে। তাদের একপ কর্মনীতি ব্যক্তিগত জীবনেই কার্যকর হবে না, তাদের সামগ্রিক জীবনেও সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে ইসলামেরই ভিত্তিতে স্থাপিত হবে। সমষ্টিগতভাবে

তাদের সম্পূর্ণ সন্তাই হবে ইসলামের জন্য নিয়োজিত—ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাদের গোটা জাতীয় চরিত্র ও ভূমিকা ও তাদের কর্মতৎপরতা ইসলামের মূলনীতির বুনিয়াদে স্থাপিত ও পরিচালিত হবে।

এ দু' প্রকারের মুসলমান মূলত সম্পূর্ণরূপে পরম্পর বিরোধী। আইনের দৃষ্টিতে উভয় শ্রেণী একই উদ্ধাত তথা একই জাতির মধ্যে গণ্য হলেও এবং 'মুসলিম' শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হলেও প্রকৃত ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যতৰ্ক। প্রথম প্রকারের মুসলমানের কোনো কীভাবে ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বা গৌরবের বস্তুরূপে পরিপন্থ হয়নি। তারা এমন কোনো কাজই করেনি, যা পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের কোনো গৌরবময় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পৃথিবী এ ধরনের মুসলমানের কোনো শুরুত্বই কোনো দিন অনুভব করেনি। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামের পশ্চাদমুস্তু গতি এ ধরনের মুসলমানের দ্বারা এবং এদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। মুসলিম সমাজে এ ধরনের মুসলমানদের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণেই মানব জীবনের ওপর কুফরির কর্তৃত স্থাপিত হওয়া এবং তার অধিক সীমাবদ্ধ ধর্মীয় জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করেই মুসলমানদের তুষ্ট হওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কখনই এ ধরনের মুসলমান চাননি। এ ধরনের মুসলমান তৈরি করার জন্য তিনি নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠাননি, এ ধরনের মুসলমান দুনিয়ায় না থাকলেও বিশেষ কোনো শুরুত্বপূর্ণ অভাব অনুভূত হতো না। আর তা পূরণের জন্য অহী নায়িল করার এ দীর্ঘস্থায়ী ধারা পরিচালনারও প্রয়োজন দেখা দিত না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যে ধরনের মুসলমান তৈরি করার জন্য নবী পাঠিয়েছেন ও কিভাব নায়িল করেছেন, আর যারা ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য কার্যসম্পাদন করেছে এবং এখনও করতে সমর্থ তারা হচ্ছে শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান।

কেবল ইসলামের ব্যাপারেই একথা সত্য নয়। যারা নিজেদের নীতি ও আদর্শকে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখে ও তাকে জীবনের একটি পরিশিষ্টরূপে গণ্য করে এবং নিজেদের জীবন ও মৃত্যু অন্য কোনো জিনিসের জন্য উৎসর্গ করে তাদের দ্বারা দুনিয়ার কোনো আদর্শেরই পতাকা উন্মীত হতে পারে না। বর্তমান সময়েও একথার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। একটি আদর্শের প্রকৃত নিষ্ঠাবান অনুসারী কেবল তারাই হতে পারে যারা মন ও প্রাণ দিয়ে তার অনুসরণ ও তার খেদমতের কাজে আত্মসমর্পণ করে—যারা নিজেদের পূর্ণ ব্যক্তিসত্ত্বকে এরই জন্য উৎসর্গ করে এবং যারা নিজেদের অধিকারভূক্ত কোনো জিনিসকে—নিজের প্রাণ ও সন্তানকে পর্যন্ত তা অপেক্ষা

বেশী ভালো না বাসে। বস্তুত দুনিয়ায় এ ধরনের লোকদের দ্বারাই কোনো বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করতে পারে। এজন্যই প্রত্যেকটি আদর্শ এ ধরনের লোকের প্রতীক্ষা করে।

অবশ্য একটি ব্যাপারে ইসলাম ও অন্যান্য আদর্শের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য আদর্শও মানুষের কাছে উল্লেখিত রূপ আত্মসমর্পণ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আনুগত্যের দাবী করে বটে, কিন্তু মূলত দাবী করার তাদের কোনোই অধিকার নেই। এটা বরং মানুষের ওপর তাদের একটি অন্যায় আবদার মাত্র। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি ইসলামের দাবী অত্যন্ত শাশ্বত ও স্বাভাবিক। একটি আদর্শ যেসব কারণে অন্যান্য মানুষের কাছে তার নিজের সমগ্র জীবন পূর্ণ ব্যক্তি সম্মতে উৎসর্গ করার দাবী জানায়, মূলত সেসবের মধ্যে একটি জিনিসের জন্য মানুষ তার নিজের কোনো জিনিসকে কুরবান করতে পারে না। কিন্তু ইসলাম যে আল্লাহর জন্য মানুষের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার দাবী করে প্রকৃতপক্ষে সে জন্যই মানুষের উৎসর্গিত হওয়া বাস্তুনীয়। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর। মানুষ নিজেই আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের কাছে এবং মানুষের মধ্যে যা আছে, সবকিছুই আল্লাহর মালিকানা। মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব জিনিস দ্বারা কাজ করে তাও আল্লাহর। কাজেই জ্ঞান-বুদ্ধি ও সূবিচারের দৃষ্টিতে এটাই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, যা আল্লাহর তা আল্লাহরই পথে উৎসর্গ করতে হবে। অপরের জন্য কিংবা নিজ স্বার্থ ও ইলিত বস্তুর জন্য মানুষ যে কুরবানী করে তা মূলত খিয়ানত—অন্যায় ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কিছু করলে তা নিশ্চয়ই খিয়ানত হবে না। কেননা আল্লাহর জন্য যা কিছুই উৎসর্গ করা হয়, তা দ্বারা মূলত আল্লাহরই হক আদায় করা হয়।

কিন্তু যারা বাতিল মতবাদ ও আদর্শ এবং নিজেদের অবগঢ়া ইলাহ ও প্রভুদের জন্য নিজেদের সবকিছু কুরবান করে এবং সে জন্য অবচল ও দৃঢ়তা সহকারে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের কর্মতৎপরতা হতে মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণ করা আবশ্যিক। বাজিলের জন্য যখন মানুষ এত নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করতে পারে তখন সত্যের জন্য যদি তার এক সহস্রাংশ ত্যাগ স্বীকার করা না হয় তবে তা কত পরিতাপের বিষয়।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস হতে ঈমান ও ইসলামের যে সঠিক মাপকাঠির সঙ্গান পাওয়া যায়, তদনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককেই আত্মপরীক্ষা করা কর্তব্য। আপনি যদি ইসলাম কবুল করার ও ঈমান আনার দাবী করেন তবে আপনার জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত কিনা, তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

যাচাই করে দেখা বাস্তুনীয়। আপনি একমাত্র আল্লাহরই জন্য জীবিত কিনা, আপনার মন ও মন্তিকের সমগ্র যোগ্যতা-ক্ষমতা, আপনার দেহ ও প্রাণের শক্তি, আপনার সময় ও শ্রম একমাত্র আল্লাহর মর্জী পূরণের জন্য এবং মুসলিম উচ্চাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত কিনা তা বিশেষভাবে যাচাই করে দেখা কর্তব্য। আপনার বদ্দেগী ও আনুগত্য আল্লাহরই জন্য কিনা, অন্যদিকে নফসের দাসত্ব এবং পরিবার, গোত্র, বক্তৃ-বাক্তব ও সমাজ তথা সরকারের বদ্দেগী হতে আপনার জীবন সম্পূর্ণরূপে মুক্ত কিনা, তাও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আপনার পসন্দ-অপসন্দ আল্লাহর মর্জী অনুযায়ী নির্ধারিত কিনা তাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। আরও বিচার করে দেখুন, আপনি যাকে ভালোবাসেন, সেই করেন, তা কি একমাত্র আল্লাহর জন্য করেন? যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন, তাও কি আল্লাহর জন্য করেন? এ ঘৃণা ও ভালোবাসায় আপনার নিজের কোনো স্বার্থ কাজ করে না তো? দেয়া না দেয়াও কি আল্লাহরই জন্য হচ্ছে? নিজের উদর ও মন সহ দুনিয়ায় যাকে যা কিছু আপনি দেন, তা দিয়ে কি আপনি একমাত্র আল্লাহরই সন্তোষ পেতে চান? পক্ষান্তরে আপনার না দেয়াও কি ঠিক আল্লাহরই জন্য হচ্ছে? আপনি কি এজন্য দিষ্টেন না যে, আল্লাহ তাআলা দিতে নিষেধ করেছেন? এবং না দিয়ে কি আপনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করছেন? এরপে সবকিছুই আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার ভাবধারা যদি আপনি আপনার নিজের মধ্যে বর্তমান দেখতে পান তবে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করুন। কেননা আল্লাহ সত্যই আপনার ইমানকে পূর্ণতা দান করেছেন। কিন্তু এদিক দিয়ে যদি আপনি আপনার মধ্যে কোনো প্রকার অভাব অনুভব করেন, তবে তা দূর করার জন্য এখনই যত্নবান হোন, সকল চেষ্টা ও তৎপরতা এদিকে নিবন্ধ করুন। কেননা এ অভাব পূরণের উপরই আপনার ইহকাশীন সাক্ষ্য ও পরকাশীন মুক্তি নির্ভর করে। দুনিয়ায় আপনি কোনো মহাসশ্নদ লাভ করলেও তা ধারা এ অভাব পূরণ হতে পারে না। কিন্তু এ অভাব যদি আপনি পূরণ করে নিতে পারেন, তবে দুনিয়ায় আপনি কিছু না গেলেও প্রকৃতপক্ষে আপনি কোনোক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।

স্বরূপ রাখতে হবে যে, কুরআন হাদীসের এ মাপকাঠিতে অপরকে যাচাই করার জন্য এবং তাকে সুমিল কিংবা সুনাক্ষিক অধৰা মুসলিম কিংবা কাফের বলে ঘোষণা করার জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজেকে বাঁচাবার জন্য এবং পরকালের বিচারালয়ের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার পূর্বে এ দুনিয়ায় নিজের ঝটি জেনে তা সংশোধন করার জন্যই এ মাপকাঠি নির্ধারিত হয়েছে। দুনিয়ার মুক্তি ও কাজী আপনাকে কি মনে করছেন সেই চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই,

মহাবিচারক—গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুর একমাত্র জ্ঞাতা—আল্লাহ আপনাকে কি স্থান দেন তাই আপনাকে চিন্তা করতে হবে। দুনিয়ার আদমশুমারীর খাতায় আপনি মুসলিম রূপে গণ্য হয়েছেন দেখেই আপনার নিশ্চিত হয়ে বসে ধাকা উচিত নয়। আল্লাহর দফতরে আপনার কি ঘর্যাদা দেয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে সতর্ক হওয়া আপনার কর্তব্য। সমগ্র পৃথিবী আপনাকে ঈমান ও ইসলামের সাটিফিকেট দিলেও প্রকৃতপক্ষে আপনার কোনো লাভ নেই। মূল বিচার যে আল্লাহর হাতে তাঁরই কাছে মুনাফিকের পরিবর্তে মু'মিন—অবাধ্যের পরিবর্তে অনুগত বাস্তাহ রূপে গণ্য হওয়াই আপনার জীবনের প্রকৃত সাফল্য।

আল্লাহর হৃকুম পালন করা দরকার কেন ?

পুরৈই কয়েকটি প্রবন্ধে আপনাদেরকে আমি বার বার একথাই বলেছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হৃকুম মেনে চলার নামই ইসলাম এবং মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের খাইশে, বাপ-দাদার কুসংস্কার, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও লোকদের আদেশ অনুযায়ী চলা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই মুসলমান হতে পারবে না।

কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের হৃকুম পালন করার ওপর এত জোর কেন দেয়া হয়, এখানে আমি সেই কথারই বিস্তারিত আলোচনা করবো। একজন মানুষ জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আল্লাহর আনুগত্য করার দরকারটা কি, তিনি কি আমাদের আনুগত্য পাবার মুখাপেক্ষী ? আর সে জন্যই কি আল্লাহ আমাদের কাছে তাঁর নিজের এবং তাঁর রাসূলের হৃকুম পালন করে চলার দাবী করছেন ? দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যে রকম নিজেদের হৃকুমাত চালাবার জন্য লালায়িত, আল্লাহ কি তেমন লালায়িত ?—দুনিয়ার জনগণ যেমন বলে যে, আমার প্রভৃতু স্বীকার করো আল্লাহও কি তেমনি বলেন ? এখন একথারই আমি জবাব দিতে চাই।

আসল কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছে তার আনুগত্য দাবী করেন তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য নয়। বরং এ মানুষেরই কল্যাণের জন্য তিনি তা চাচ্ছেন। আল্লাহ দুনিয়ার রাজা-বাদশাহের মত নন, দুনিয়ার রাজা ও রাজ-কর্মচারীগণ তো শুধু নিজেদেরই স্বার্থের জন্য লোকদের ওপর তাদের হৃকুমাত চালায়—লোকদেরকে নিজেদের মর্জীর গোলাম বানাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কোনো স্বার্থ নেই, তিনি সকল রকম স্বার্থের নীচতা হতে পবিত্র। আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করার কোনো দরকার আল্লাহর নেই। প্রাসাদ তৈরি করা, মোটর গাড়ী ক্রয় করা কিংবা আপনাদের টাকা-পয়সা, বিলাস-ব্যসন বা আরাম-আয়েশের সামগ্ৰী সংগ্ৰহ করার কোনো প্ৰয়োজনই তাঁর নেই। তিনি পাক, তিনি কারো মোহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার সবকিছুই তাঁর, সমস্ত ধন-সম্পদের তিনিই একমাত্র মালিক। তিনি আপনাদেরকে তাঁর হৃকুম মেনে চলতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে বলেন, শুধু আপনাদেরই মংগলের জন্য—আপনাদেরই কল্যাণ করতে চান তিনি। তিনি মানুষকে ‘আশৱাফুল মাখলুকাত’ করে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর এ শ্ৰেষ্ঠ মাখলুক বা বিৱাট সৃষ্টি মানুষেরা শয়তানের গোলামী কৰুক, কিংবা অন্য মানুষের দাস

হোক অথবা দুনিয়ার সামান্য ও হীন জিনিসের সামনে মাথা নত করুক এটা তিনি মাত্রই পদ্ধতি করেন না। তিনি যে মানুষকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন, তারা মূর্খতার অঙ্ককারে ঘুরে মরুক এবং পশুর মতো নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হোক—এটা ও তাঁর মনপুত নয়। এজন্যই তিনি মানুষকে বলেছেন : “হে মানুষ ! তোমরা আমারই হকুম মেনে চল—কেবল আমারই নির্দেশ মত চল—কেবল আমারই আনুগত্য কর। আমি আমার নবীর মারফতে তোমাদের কাছে যে জ্ঞানের আলো পাঠিয়েছি, তা গ্রহণ কর ; তবে তোমরা সরল ও সোজা পথের সঞ্চান পেতে পারবে। আর এ সোজা পথে চলে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্রই সম্মান লাভ করতে পারবে।”

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ بَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْفَغِيْرِ وَمَنْ يُكْفِرُ بِالْطَّاغُوتِ
وَيَؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوْفِ الْوُتْقِيِّ لَا إِنْفِصَامَ لَهَا ۝ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الدِّينِ أَمْنَوْا لَا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمِتِ إِلَى
النُّورِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلَيْهِمُ الطَّاغُوتُ لَا يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلْمَتِ ۝ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيْفُونَ ۝- البقرة : ২৫৭-২৫৬

“দীন ইসলামের ব্যাপারে কোনো জোর-যবরদণ্ডি নেই। হেদায়াতের সোজা পথ গোমরাহীর বাঁকা পথ হতে ভিন্ন করে একেবারে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। এখন তোমাদের মধ্যে যারাই মিথ্যা খোদা এবং ভ্রান্ত পথে চালনাকারীদেরকে ত্যাগ করে কেবল এক আল্লাহর প্রতিই ঈমান আনবে, তারা এত ময়বৃত রজ্জু ধারণ করতে পারবে, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয়। আল্লাহ সবকিছুই শুনতে পান এবং সবকিছুই তিনি অবগত আছেন। যারা ঈমান আনলো তাদের রক্ষাকারী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, তিনি তাদেরকে অঙ্ককার হতে মুক্তি দান করে আলোকের উজ্জলতম পথে নিয়ে যান। আর যারা আল্লাহকে অঙ্কীকার করে তাদেরকে রক্ষা করার ভার তাদের মিথ্যা খোদা ও গোমরাহকারী নেতাদের ওপর অর্পিত হয়। তারা তাদেরকে আলো হতে পথভ্রষ্ট অঙ্ককারে নিমজ্জিত করে। তারা দোষখে যাবে ও সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।”—সূরা বাকারা : ২৫৬-২৫৭

আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্য মিথ্যা খোদার হকুম মানলে ও তাদের আনুগত্য করলে মানুষ কেন অঙ্ককারে নিমজ্জিত হয়, আর কেবল আল্লাহর আনুগত্য।

করলেই কেন আলোকোজ্জল পথ লাভ করা যাবে তা আপনাদের বিচার করে দেখা আবশ্যিক ।

আপনারা দেখছেন, দুনিয়ায় আপনাদের জীবন অসংখ্য রকম সম্পর্কের সাথে জড়িত । আপনাদের প্রথম সম্পর্ক আপনাদের দেহের সাথে । হাত, পা, কান, চোখ, জিহ্বা, মন, মগ্য এবং পেট সমস্তই আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে দান করেছেন আপনাদের খেদমত করার জন্য । কিন্তু এগুলো দ্বারা আপনারা কিভাবে খেদমত নিবেন, তা আপনাদেরই বিচার করতে হবে । পেটকে কি খেতে দেবেন এবং কি খেতে দিবেন না ; হাত দ্বারা কি করবেন, কি করবেন না ; পা দু'খানিকে কোন্ পথে চালাবেন কোন্ পথে চালাবেন না ; চোখ ও কান দ্বারা কি কাজ করাবেন আর কি কাজ করবেন না ; মনে কোন্ কথার খেয়াল রাখবেন আর কোন্ কথার রাখবেন না ; মন-মগ্য দিয়ে কোন্ কথার চিন্তা করবেন আর কোন্ কথার চিন্তা করবেন না—এসবই আপনাকে সবদিক চিন্তা করে ঠিক করতে হবে । এরা সবাই আপনার চাকর এদের দ্বারা আপনি ভালো কাজও করাতে পারেন, আর পাপের কাজও করাতে পারেন । এরা আপনার কাজ করে আপনাকে উচ্চতম মর্যাদার মানুষেও পরিণত করতে পারে আবার এরা আপনাকে জন্মুর চেয়েও নিকৃষ্ট ও নীচ জীবও বানিয়ে দিতে পারে ।

অতপর আপনার নিকটতম সমস্ক আপনার ঘরের লোকদের সাথে—বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথে—আপনাকে রাত-দিন সকল সময়ের জন্য সমস্ক রেখে চলতে হয় । কিন্তু এদের সাথে আপনি কিরূপ ব্যবহার করবেন, তা আপনাকে বিশেষভাবে চিন্তা করেই ঠিক করতে হবে । এদের ওপর আপনার কি 'হক' (অধিকার) আছে এবং আপনার ওপরই বা এদের কি অধিকার আছে, তা আপনার ভালো করে জেনে নেয়া দরকার । মনে রাখবেন, এদের সাথে আপনার ব্যবহার সুষ্ঠু হওয়ার ওপরই আপনার দুনিয়া ও আখ্রোতের সুখ-শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে । যদি এদের সাথে আপনি ডুল ব্যবহার করেন তবে দুনিয়াকেই আপনি নিজের জন্য জাহান্নামে পরিণত করবেন । আর শুধু দুনিয়াই নয়, পরকালেও আপনাকে আল্লাহর কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে ।

এরপর আসে দুনিয়ার অন্যান্য অগণিত লোকের সাথে আপনার সম্পর্কের কথা । অনেক লোক আপনার পাড়া-পড়শী, বহলোক আপনার বন্ধু, কতগুলো লোক আপনার দুশ্মন । বহলোক আপনার খেদমত করে এবং আপনি বহলোকের খেদমত করেন । আপনি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন এবং কাউকে আপনি কিছু দেন । কেউ আপনার ওপর ভরসা করে তার কাজের ভার আপনাকে দেয়, আবার আপনি কারো ওপর ভরসা করে আপনার কাজের ভার

তার ওপর অর্পণ করেন। কেউ আপনার বিচারক আর আপনি অন্য কারো বিচারক। আপনি কাউকে হকুম দেন আবার আপনাকে কেউ হকুম দেয়। ফলকথা, কত সংখ্যক লোকের সাথে আপনার রাত-দিন কোনো না কোনো সম্পর্ক রেখেই চলতে হয়, যার হিসেব করে আপনি শৈষ করতে পারেন না। এ সম্পর্কগুলো আপনাকে খুব ভালোভাবেই রক্ষা করতে হয়। দুনিয়ায় আপনার সুখ-শান্তি, পসন্দ-অপসন্দ, স্ফূর্তি, সফলতা, মান-সম্মান ও সুন্মাম অর্জন একান্তভাবে এরই ওপর নির্ভর করে। সেগুলোকে খুব ভালোভাবে রক্ষা করতে পারলে আপনি দুনিয়ায় সুখ-শান্তি এবং আনন্দ ও গৌরব লাভ করতে পারেন, নতুবা পারেন না। অনুরূপভাবে যদি পরিকালে আপনি আল্লাহর কাছে কারোও অধিকার হরণকারী সাব্যস্ত না হয়ে হাজির হতে পারেন, তাহলে আপনি তার কাছে সম্মান লাভ করতে পারেন এবং সেজন্য আপনাকে এমনভাবে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে যেন আপনি কারো হক নষ্ট করেননি, কারো ওপর যুগ্ম করেননি, কেউ আপনার বিকলঙ্ঘে কোনো নালিশ করে না, কারো জীবন নষ্ট করার দায়িত্ব আপনার ওপর নেই এবং কারো জান-মাল ও সম্মান আপনি অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি। কাজেই এখন আপনাকে এই ফায়সালা করতে হবে যে, এই অগণিত লোকের সাথে সঠিকভাবে সম্পর্ক কিভাবে রাখা যাবে এবং যেসব কারণে এসব সম্পর্ক ছিন্ন, নষ্ট বা তিক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে তা জেনে নিয়ে তা থেকে আপনাকে ফিরে থাকতে হবে।

এখন আপনারা চিন্তা করুন যে, আপনাদের দেহের সাথে, আপনাদের পরিবারের লোকদের সাথে এবং দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত লোকের সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখার জন্য জীবনের প্রতি ধাপে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো লাভ করা আপনাদের কতখানি আবশ্যিক। প্রতি ধাপে আপনার জানা চাই যে, কোন্ট্রা মিথ্যা ? সুবিচার কি এবং যুগ্ম কি ? আপনার ওপর কার কি পরিমাণ অধিকার আছে ? জীবনের কোন্ কাজে প্রকৃত উপকার পাওয়া যাবে আর কিসে আসল ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ? কিন্তু এসব কিছুর জ্ঞান আপনি কোথায় পেতে পারেন ? এটা যদি আপনি আপনার মনের কাছে জানতে চান, তবে সেখানে তা পাবেন না। কারণ আপনার মন নিজেই অজ্ঞ ও মূর্খ, নিজের স্বার্থ ও অসৎ কামনা ছাড়া আর কিছুই জানা নেই। সে তো বলবে : মদ খাও, যেনা কর, হারাম উপায়ে টাকা রোয়গার কর। কারণ এসব কাজে খুবই আনন্দ আছে। সে বলবে, সকলেরই হক মেরে খাও, কাউকে হক দিও না। কারণ তাতে লাভও আছে, আরামও আছে। এমন একটা অজ্ঞ-মূর্খের হাতে যদি আপনি আপনার জীবনের রঞ্জ ছেড়ে দেন—মন যা চায়, যদি কেবল তাই করেন, তবে এটা

আপনাকে একেবারে অধিপতনের চরম সীমায় নিয়ে যাবে। এমনকি, পরিণামে আপনি একজন নিকৃষ্ট স্বার্থপুর, ইনচেতা ও পাপিষ্ঠে পরিণত হবেন। এতে আপনার ধীন-দুনিয়া সবকিছুই নষ্ট হবে।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে এই যে, আপনি আপনার মনের খাতেশের কথা না শনে আপনারই মতো অন্য মানুষের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করবেন এবং প্রত্যেক কাজেই আপনি সেই লোকদের কথামত কাজ করবেন। তারা যদিকে চালায়, আপনি অঙ্গভাবে সেদিকেই চলবেন। এ পথ যদি অবলম্বন করেন, তবে কোনো স্বার্থপুর লোক এসে আপনাকে তার নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত এবং নিজের স্বার্থেকারের জন্য ব্যবহার করতে পারে, এর খুবই আশংকা আছে। কিংবা কোনো মূর্খ ও পথচারী লোক এসে আপনাকেও বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। অথবা কোনো যালেম ব্যক্তি আপনাকে হাতিয়ার স্বরূপ গ্রহণ করে আপনার দ্বারা অন্যের ওপর যুলুম করাতে পারে। মোটকথা, অন্য লোকের অনুসরণ করলেও আপনি জ্ঞানের সেই জরুরী আলো লাভ করতে পারেন না, যা আপনাকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাতে, ন্যায় ও অন্যায় বলে দিতে পারে এবং আপনার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

এরপর একটি মাত্র উৎসই থেকে যায় যেখান থেকে আপনি আপনার এ অত্যাবশ্যক জ্ঞানের আলো লাভ করতে পারেন। সেই উপায়টি হচ্ছে আপনার ও নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা সবকিছুই অবগত আছেন, সবকিছুই দেখতে পান, প্রত্যেকটি জিনিসের প্রকৃতি তিনি ভাল করেই জানেন ও বুঝেন। একমাত্র তিনিই বলে দিতে পারেন যে, কোনু জিনিসে আপনার প্রকৃত উপকার, আর কোনু জিনিসে আপনার আসল ক্ষতি হতে পারে, কোনু কাজ আপনার করা উচিত, কোনু কাজ করা উচিত নয়—তা একমাত্র তিনিই বলে দিতে পারেন। আল্লাহ তাআলার কোনো কিছুর অভাব নেই, তাঁর কোনো স্বার্থ নেই, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই। তিনি ধোঁকা দিয়ে (নাউয়ুবিল্লাহ) আপনার কাছ থেকে তাঁর নিজের কোনো স্বার্থ আদায় করবেন না। কারণ তিনি পাক-পবিত্র, তিনি সবকিছুই মালিক, তিনি যা কিছু পরামর্শ দিবেন তার মধ্যে তাঁর নিজের স্বার্থের কোনো গন্ধ নেই এবং তা কেবল আপনারই উপকারের জন্য। এছাড়া আল্লাহ তাআলা ন্যায় বিচারক, তিনি কখনই কারো ওপর অবিচার করেন না। কাজেই তাঁর সকল পরামর্শ নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ, ন্যায় ও ফলপ্রসু হবে। তাঁর আদেশ অনুযায়ী চললে আপনার নিজের ওপর বা অন্য কারো ওপর কোনো যুলুম হবার আশংকা নেই।

আল্লাহর তাআলার কাছ থেকে যে আলো পাওয়া যায়, তা থেকে কল্যাণ লাভ করা দু'টি জিনিসের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে। প্রথম জিনিস এই যে, আল্লাহর তাআলা এবং তিনি যে নবীর সাহায্যে এ আলো পাঠিয়েছেন সেই নবীর প্রতি আপনাকে প্রকৃত ইমান আনতে হবে, আপনাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর রাসূল যে বিধান ও উপদেশ নিয়ে এসেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য; তার সত্যিকার উপকারিতা যদি আপনি অনুভব করতে না-ও পারেন তবুও আপনাকে একথা বিশ্বাস করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ঈমান আনার পর আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি কাজেই আল্লাহর সেই বিধান অনুসরণ করে চলবেন। কারণ তার প্রতি ঈমান আনার পর কার্যত তাঁর অনুসরণ না করলে সেই আলো হতে কিছুমাত্র ফল পাওয়া যেতে পারে না। মনে করুন, কোনো ব্যক্তি আপনাকে বললো, অমুক জিনিসটি বিষ, তা প্রাণীর প্রাণ নাশ করে; কাজেই তা খেও না। আপনি বললেন, হাঁ ভাই, তুমি যা বলেছ তা খুবই সত্য, তা যে বিষ এবং তা প্রাণ ধ্বংস করে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সত্য জেনে-গুনে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্বীকার করেও আপনি তা খেলেন। এখন বিষের যা আসল ক্রিয়া তা তো হবেই। জেনে খেলেও হবে, না জেনে খেলেও হবে। আপনি তা না জেনে খেলেও জেনে খাওয়ার মত একই ফল হতো। এরূপ জানা ও না জানার মধ্যে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই। আর এরূপ জানা এবং স্বীকার করার প্রকৃত ফল ও উপকারিতা আপনি ঠিক তখনই পেতে পারেন যখন আপনি কোনো সত্য জানার ও স্বীকার করার সাথে সাথে সেই অনুসারে কাজ করবেন। আপনাকে যে কাজের হকুম দেয়া হয়েছে, কেবল মুখে মুখে তাকে সত্য বলে স্বীকার করেই বসে থাকবেন না বরং তাকে কাজে পরিগত করবেন। আর যে কাজ করতে আপনাকে নিষেধ করা হয়েছে, শুধু মুখে মুখে তা থেকে ফিরে থাকার কথা মেনে নিলে চলবে না, বরং আপনার জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারেই সেই নিষিদ্ধ কাজ হতে ফিরে থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহর তাআলা বার বার বলেছেন :

أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ - النساء : ٥٩

“আল্লাহ ও রাসূলের হকুম মেনে চল।”-(সূরা আন নিসা : ৫৯)

وَإِنْ تُطِعْنُوهُ تَهْتَدُوا - النور : ٥٤

“যদি তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর, তবেই তোমরা সৎপথের সঙ্কান পাবে।”-সূরা আন নূর : ৫৪

فَلَيَحْذِرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ - النور : ٦٣

“যারা আমার রাসূলের হকুমের বিরোধিতা করছে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর বিপদ আসতে পারে।” -সূরা আন নূর : ৬৩

আমি আপনাদেরকে বারবার বলছি যে, কেবল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করা উচিত ; এর অর্থ এই নয় যে, কোনো মানুষের হকুম আদৌ মানতে হবে না । আসলে এর অর্থ এই যে, আপনারা অঙ্গ হয়ে কারো পিছনে চলবেন না । সবসময়ই আপনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কেবল এটাই দেখবেন যে, যে ব্যক্তি আপনাকে কোনো কাজ করতে বলে, তা আল্লাহ ও রাসূলের হকুমের অনুরূপ, না তার বিপরীত । যদি তার অনুরূপ হয়, তবে তা মেনে নেয়া অবশ্যই কর্তব্য । কারণ, সেই হকুম মতো কাজ করলে তাতে আসলে সেই ব্যক্তির নিজের হকুম পালন করা হয় না, তা করলে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলেরই আনুগত্য করা হবে । আর সে যদি আল্লাহ ও রাসূলের হকুমের বিপরীত হকুম দেয়, তবে তা তার মুখের ওপর নিষ্কেপ করুন, সে যে ব্যক্তি হোক না কেন । কারণ, আল্লাহ ও রাসূলের হকুম ছাড়া অন্য কারো হকুম পালন করা একেবারেই জায়েয় নয় ।

আপনারা একথা সহজেই বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ তাআলা নিজে মানুষের সামনে এসে হকুম দেন না, তাঁর যা কিছু হকুম-আহকাম দেয়ার ছিল, তা সবই তাঁর রাসূলের মারফতে পাঠিয়েছেন । আমাদের সেই প্রিয় নবীও প্রায় চৌদ্দ শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন । তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলা যা কিছু হকুম-আহকাম দিয়েছিলেন, তা সবই এখন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নিহিত আছে । কিন্তু এ কুরআন শরীফ এমন কোনো জিনিস নয়, যা নিজেই আপনাদের সামনে এসে আপনাদেরকে আল্লাহর কথা বলতে ও হকুম দান করতে পারে এবং আপনাদেরকে আল্লাহর নিষিদ্ধ পথ হতে বিরত রাখতে পারে । মানুষই আপনাদেরকে কুরআন ও হাদীস অনুসারে পরিচালিত করবে । কাজেই মানুষের অনুসরণ না করে তো কোনো উপায় নেই । অবশ্য অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, আপনারা কোনো মানুষের পিছনে অঙ্গভাবে চলবেন না । আপনারা সতর্কভাবে শুধু এতটুকুই দেখবেন যে, সেই লোকেরা আপনাদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুসারে পরিচালিত করে কিনা । যদি কুরআন ও হাদীস অনুসারে চালায় তবে তাদের অনুসরণ করা আপনাদের কর্তব্য এবং তার বিপরীত পথে চালালে তাদের অনুসরণ করা পরিষ্কার হারাম ।

দীন ও শরীয়াত

ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার সময় আপনারা দু'টি শব্দ প্রায়ই শুনে থাকেন এবং আপনারা নিজেরাও প্রায়ই বলে থাকেন। সেই দু'টি শব্দের একটি হচ্ছে দীন ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে শরীয়াত। কিন্তু অনেক কম লোকই এ শব্দ দু'টির অর্থ ও তাৎপর্য ভালো করে জানে। যারা লেখা-পড়া জানে না, তারা এর অর্থ না জানলে তা কোনো অপরাধের কথা নয় ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভালো ভালো শিক্ষিত লোকেরা—এমন কি বহু মৌলভী সাহেব পর্যন্ত শব্দ দু'টির সঠিক অর্থ এবং এ দু'টির পারস্পরিক পার্থক্য সম্পর্কে আদো ওয়াকিবহাল নন। এ দু'টির অর্থ ভালো করে না জানায় অনেক সময় ‘দীন’কে শরীয়াতের সাথে এবং শরীয়াতকে দীনের সাথে একেবারে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেয়া হয়। এতে অনেক প্রকার ভুল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে। এ প্রবন্ধে আমি খুব সহজ কথায় এ শব্দ দু'টির অর্থ আপনাদের কাছে প্রকাশ করবো।

দীন (Din) শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। প্রথম : শক্তি, কর্তৃত, হস্তিমাত, রাজত্ব-আধিপত্য এবং শাসন ক্ষমতা। দ্বিতীয় : এর সম্পূর্ণ বিপরীত যথা—নীচতা, আনুগত্য, গোলামি, অধীনতা এবং দাসত্ব। তৃতীয়, হিসেব করা ফায়সালা করা ও যাবতীয় কাজের প্রতিফল দেয়া। কুরআন শরীফে ‘দীন’ (Din) শব্দটি এ তিনি প্রকারের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে :

اَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ اَلْاسِلَامُ فَ- الْعِمَرَانَ : ۱۹

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তাই হচ্ছে একমাত্র ‘দীন’ যাতে মানুষ শুধু আল্লাহ তাআলাকেই শক্তিমান মনে করে এবং তাকে ছাড়া আর কারো সামনে নিজেকে নত মনে করে না। কেবল আল্লাহকেই মনিব, মালিক, বাদশাহ ও রাজাধিরাজ বলে মানবে এবং তিনি ছাড়া আর কারো দাস, গোলাম, হুকুম বরদার, অধীন ও তাবেদার হবে না। শুধু আল্লাহকেই হিসেবে প্রহণকারী ও সকল কাজের উপযুক্ত প্রতিফলদাতা মনে করবে এবং তিনি ছাড়া আর কারো কাছে হিসেবে দেয়ার পরোয়া করবে না ; অন্য কারো কাছে প্রতিফল পাবার আশা করবে না এবং কারো শাস্তির ভয় করবে না। এ ‘দীনের’ই নাম হচ্ছে ‘ইসলাম’। কোনো মানুষ যদি এ আকীদা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আসল শক্তিমান, আইন রচয়িতা, আসল বাদশাহ ও মালিক, প্রকৃত প্রতিফলদাতা মনে করে এবং তার সামনে বিনয়ের সাথে মাথা নত করে, যদি তাঁর বন্দেগী ও গোলামী করে, তাঁর আদেশ মতো কাজ করে এবং তার প্রতিফলের আশা ও তার শাস্তির ভয় করে, তাহলে তাকে মিথ্যা ‘দীন’ মনে করতে হবে। আল্লাহ এমন

‘দীন’ কখনও কবুল করবেন না। কারণ এটা প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ খেলাপ। এ নিখিল পৃথিবীতে আসল শক্তিমান ও সশান্তি সত্তা আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়। এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো আধিপত্য নেই, বাদশাহী নেই। আর মানুষকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী ও গোলামী করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সেই আসল মালিক ছাড়া কাজের প্রতিফল দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। একথাই অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে :

وَمَنْ يُبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۝ - الْعُمَرَانَ : ٨٥

অর্থাৎ আল্লাহর আধিপত্য ও প্রভুত্ব হেড়ে যে ব্যক্তি অন্য কাউকে নিজের মালিক এবং আইন রচয়িতা বলে স্বীকার করে, তার বন্দেগী ও গোলামী কবুল করে এবং তাকে কাজের প্রতিফলদাতা মনে করে, তার এ ‘দীন’কে আল্লাহ তাআলা কখনই কবুল করবেন না। কারণ :

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ لَا حُنْفَاءَ - الْبَيْنَةَ : ٥

“মানুষকে আল্লাহ তাঁর নিজের বাদ্যাহ করে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করার আদেশ মানুষকে দেয়া হয়নি। তাদের একমাত্র অবশ্য কর্তব্য ফরয এই যে, সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু আল্লাহর জন্যই নিজের দীন—অর্থাৎ আনুগত্য ও গোলামীকে নিযুক্ত করবে, একমুখ্য হয়ে তাঁরই বন্দেগী করবে এবং শুধু তাঁরই হিসেব করার ক্ষমতাকে ডয় করবে।”—সূরা আল বাইয়েনা ৪৫

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَالَّذِي يُرْجَعُونَ ۝ - الْعُمَرَانَ : ٨٣

“মানুষ কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলামী ও হকুম পালন করতে চায়? অথচ প্রকৃতপক্ষে আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলারই একান্ত গোলাম ও হকুম পালনকারী এবং এসব জিনিসকে তাদের নিজেদের হিসাব-কিতাবের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে যেতে হবে না। তবুও মানুষ কি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের বিরুদ্ধে আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া আর অন্য কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়?”—সূরা আলে ইমরান : ৮৩

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۝

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ - الصَّفَ : ٩

“আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও সত্যের আনুগত্যের ব্যবস্থা সহকারে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, তিনি দুনিয়ার সকল ‘মিথ্যা খোদার’ খোদায়ী ও প্রভৃতি ধ্রংস করে দিবেন এবং মানুষকে এমনভাবে আযাদ করবেন যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বান্দাহ হবে না, কাফের আর মুশৰিকগণ নিজেদের মূর্খতার দরমন যতই চীৎকার করুক না কেন এবং একে ঘৃণা করুক না কেন।”—সূরা আস সফ : ৯

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونُنَّ فِتْنَةً وَيُكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۝ - الْأَنْفَال : ۲۹

“তোমরা যুদ্ধ কর যেন দুনিয়া হতে গায়রূপ্তাহর প্রভৃতি চিরতরে দূর হয় এবং দুনিয়ায় যেন শধু আল্লাহরই আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহর বাদশাহী যেন সকলেই স্বীকার করে এবং মানুষ যেন শধু আল্লাহরই বন্দেগী করে।”—সূরা আল আনফাল : ৩৯

ওপরের এ ব্যাখ্যা দ্বারা ‘দ্বীন’ শব্দের অর্থ পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে আশা করি। সংক্ষেপে বলতে গেলে তা এই—আল্লাহকে মালিক, মনিব এবং আইন রচনাকারী স্বীকার করা—আল্লাহরই গোলামী, বন্দেগী ও তাবেদারী করা, আল্লাহর হিসাব গ্রহণের ও তাঁর শাস্তি বিধানের ভয় করা এবং একমাত্র তাঁরই কাছে প্রতিফল লাভের আশা করা।

তারপরও যেহেতু আল্লাহর হৃকুম তাঁর কিতাব ও রাসূলের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌছিয়ে থাকে, এজন্য রাসূলকে আল্লাহর রাসূল এবং কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে মান্য করা আর কার্যক্ষেত্রে তার অনুসরণ করাও ‘দ্বীন’-এর মধ্যে গণ্য। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

يَبْرِئِي أَدَمَ إِمَّا يَأْتِيْنَكُمْ رَسُّلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَيْتَمِّ ۝ فَمَنِ اتَّقَىٰ

وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ - الْأَعْرَاق : ۳۵

“হে আদম সন্তান ! আমার নবী যখন তোমাদের কাছে বিধান নিয়ে আসবে তখন যারা সেই বিধানকে মেনে আদর্শবাদী জীবনযাপন করবে এবং সেই অনুসারে নিজেদের কাজ-কারবার সমাপন করবে, তাদের কোনো ভয়ের কারণ নেই।”—সূরা আল আরাফ : ৩৫

এর দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ সোজাসুজি প্রত্যেক মানুষের কাছে তাঁর বিধান পাঠান না, বরং তার নবীদের মাধ্যমেই পাঠিয়ে থাকেন। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে আইন রচনাকারী বলে স্বীকার করবে সেই ব্যক্তি কেবল নবীদের হৃকুম পালন করে এবং তাঁদের প্রচারিত বিধানের আনুগত্য করেই আল্লাহর হৃকুম পালন করতে পারে একে বলা হয় ‘দ্বীন’।

অতপর শরীয়াতের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করবো। শরীয়াত শব্দের অর্থ : পথ ও নিয়ম। একজন মানুষ যখন আল্লাহকে আইন রচনাকারী বলে তার বন্দেগী স্বীকার করে এবং একথাও স্বীকার করে নেয় যে, রাসূল আল্লাহর তরফ হতেই অনুমতি প্রাপ্ত আইনদাতা হিসেবে এসেছেন এবং কিতাব তাঁরই তরফ হতেই নাযিল হয়েছে, ঠিক তখনই সে দ্বীন-এর মধ্যে দাখিল হয়। এরপরে যে নিয়ম অনুযায়ী তাকে আল্লাহর বন্দেগী করতে হয় এবং তাঁর আনুগত্য করার জন্য যে পথে চলতে হয় তারই নাম হচ্ছে শরীয়াত। এ পথ ও কর্মপদ্ধতি আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের মারফতে পাঠিয়েছেন। মালিকের ইবাদাত কোনুন নিয়মে করতে হবে, পাক-পবিত্র হওয়ার নিয়ম কি, নেকী ও তাকওয়ার পথ কোনৃটি, অন্য মানুষের হক কিভাবে আদায় করতে হবে, কাজ-কারবার কিভাবে করতে হবে, জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে, এসব কথা নবীই বলেছেন। দ্বীন ও শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দ্বীন চিরকালই এক ছিল এক আছে এবং চিরকাল একই থাকবে; কিন্তু শরীয়াত দুনিয়ায় বহু এসেছে, বহু বদলিয়ে গেছে। অবশ্য শরীয়াতের এ পরিবর্তনের কারণে দ্বীনের কোনো দিনই পরিবর্তন হয়নি। হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন যা ছিল হ্যরত নূহ আল-ইহিস সালামের দ্বীনও তাই ছিল, হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামের দ্বীনও তাই ছিল। হ্যরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম, হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালাম এবং হ্যরত হুদ আলাইহিস সালামের দ্বীনও তাই ছিল এবং শেষ নবী হ্যরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনও ঠিক তাই। কিন্তু এ নবীগণের প্রত্যেকেই শরীয়াতে কিছু না কিছু পার্থক্য বর্তমান ছিল। নামায এবং রোয়ার নিয়ম এক এক শরীয়াতে এক এক রকমের ছিল। হারাম ও হালালের হুকুম, পাক-পবিত্রতার নিয়ম, বিয়ে ও তালাক এবং সম্পত্তি বন্টনের আইন এক এক শরীয়াতের এক এক রকম ছিল। কিন্তু তা সম্বেদ তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন। হ্যরত নূহ আলাইহিস সালাম, হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামের উদ্দতগণও মুসলমান ছিলেন, আর আমরাও মুসলমান কেননা সকলের দ্বীন এক। এর দ্বারা জানা গেল যে, শরীয়াতের হুকুম বিভিন্ন হলেও দ্বীন এক থাকে, তাতে কোনো পার্থক্য হয় না—দ্বীন অনুসারে কাজ করার নিয়ম-পদ্ধতি যতই বিভিন্ন হোক না কেন।

এ পার্থক্য বুঝার জন্য একটা উদাহরণ দেয়া যাচ্ছে। মনে করুন, একজন মনিবের বহু সংখ্যক চাকর আছে। যে ব্যক্তি সেই মনিবকে মনিব বলে স্বীকার করে না এবং তার হুকুম মান্য করা দরকার বলে মনেই করে না, সে তো পরিষ্কার নাফরমান এবং সে চাকরের মধ্যে গণ্যই নয়। আর যারা তাকে মনিব বলে স্বীকার করে, তার হুকুম পালন করা কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে এবং তার

হকুমের অবাধ্য হতে ভয় করে, তারা সকলেই চাকরের মধ্যে গণ্য। চাকুরী করা এবং খেদমত করার নিয়ম বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মূলত তারা সকলেই সমানভাবে সেই একই মনিবের চাকর, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। মালিক বা মনিব যদি একজন চাকরকে চাকুরীর এক নিয়ম বলে দেয় আর অন্যজনকে বলে আর এক নিয়ম তবে এদের কেউই একথা বলতে পারে না যে, আমি মনিবের চাকর কিন্তু ঐ ব্যক্তি চাকর নয়। এভাবে মনিবের হকুমের অর্থ ও উদ্দেশ্য যদি এক একজন চাকর এক এক রকম বুঝে থাকে এবং উভয়েই নিজের বুদ্ধি মত সেই হকুম পালন করে, তবে চাকুরীর বেলায় উভয়ই সমান। অবশ্য হতে পারে যে, একজন চাকর মনিবের হকুমের অর্থ ভুল বুঝেছে, আর অন্যজন এর অর্থ ঠিকমত বুঝেছে। কিন্তু হকুম মত কাজ উভয়েই যখন করেছে, তখন একজন অন্যজনকে নাফরমান অথবা মনিবের চাকুরী হতে বিচ্ছৃত বলে অভিযুক্ত করতে পারে না।

এ উদাহরণ হতে আপনারা দীন ও শরীয়াতের পারম্পরিক পার্থক্য খুব ভাল করে বুঝতে পারেন। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন নবীর মারফতে বিভিন্ন শরীয়াত পাঠিয়েছিলেন। এদের একজনকে চাকরীর এক রকমের নিয়ম বলেছেন, আর অন্যজনকে বলেছেন অন্যবিধি নিয়ম। এ সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করে আল্লাহর হকুম মতো যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন—যদিও তাদের চাকুরির নিয়ম ছিল বিভিন্ন রকমের। তারপর যখন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেন, তখন সকলের মনিব আল্লাহ তাআলা হকুম করলেন যে, এখন পূর্বের সমস্ত নিয়মকে আমি বাতিল করে দিলাম। ভবিষ্যতে যে আমার চাকুরি করতে চায় তাকে ঠিক সেই নিয়ম অনুসারেই কাজ করতে হবে, যে নিয়ম আমার শেষ নবীর মাধ্যমে আমি প্রচার করবো। এরপর পূর্বের কোনো নিয়ম অনুসারে চাকুরি করার কারো অধিকার নেই। কারণ যদি কেউ এ নৃতন নিয়মকে ঝীকার না করে এবং এখনও সেই পুরাতন নিয়ম মতো চলতে থাকে, তবে বলতে হবে যে, সে আসলে মনিবের হকুম মানছে না, সে তার নিজের মনের কথাই মানছে। কাজেই এখন সে চাকুরি হতে বরখাস্ত হয়েছে।—অর্থাৎ ধর্মের পরিভাষায় সে কাফের হয়ে গেছে।

প্রাচীন নবীগণকে যারা এখনও মেনে চলতে চায় তাদের সমক্ষে একথাই প্রযোজ্য। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগামী যারা তাদের সম্পর্কে উল্লেখিত উদাহরণের দ্বিতীয় অংশ বেশ খেটে যায়। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে

আমাদের কাছে যে শরীয়াত পাঠিয়েছেন, তাকে যারা আল্লাহর শরীয়াত বলে স্বীকার করে এবং তা পালন করা কর্তব্য বলে মনে করে, তারা সকলেই মুসলমান। এখন এই শরীয়াতকে একজন যদি একভাবে বুঝে থাকে আর একজন অন্যভাবে এবং উভয়ই নিজ নিজ বুদ্ধিমত সেই অনুসারে কাজ করে তবে তাদের বাহ্যিক কাজে পরম্পরের মধ্যে যতই পার্থক্য হোক না কেন, তাদের কেউই চাকুরি হতে বিচ্যুত হবে না। কারণ এই যে, তাদের প্রত্যেকেই যে নিয়মে কাজ করছে সে একান্তভাবে মনে করে যে, তা আল্লাহর দেয়া নিয়ম এবং এটা বুঝেই সে সেই নিয়ম অনুসরণ করছে। কাজেই একজন চাকর কেমন করে বলতে পারে যে, আমিই খাটি চাকর আর অমুক খাটি চাকর নয়। সে বেশী কিছু বললেও শুধু এতটুকু বলতে পারে যে, আমি মনিবের হকুমের ঠিক অর্থ বুঝেছি, আর অমুক লোক ঠিক অর্থ বুঝতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে অন্যজনকে চাকুরি হতে খারিজ করে দেয়ার বা খারিজ মনে করার তার কোনো অধিকার নেই; তবুও যদি কেউ এতখানি দৃঢ়সাহস করে তবে আসল মনিবের পদকে সে নিজের বিনা অধিকারে দখল করছে। তার কথার অর্থ এই হয় যে, তুমি তোমার মনিবের হকুম মানতে যেরূপ বাধ্য, আমার হকুম মানতেও তুমি অনুরূপভাবে বাধ্য। আমার হকুম যদি তুমি না মান তাহলে আমি আমার ক্ষমতা দ্বারা মনিবের চাকুরি হতে তোমাকে খারিজ করে দিব। একটু ভেবে দেখুন, এটা কত বড় স্পর্ধার কথা। এ কারণেই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে অকারণে কাফের বলবে, তাঁর কথা স্বয়ং তার নিজের ওপরই বর্তিবে। কারণ মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা নিজের হকুমের গোলাম বানিয়েছেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বলে—না, তুমি আমার বুদ্ধি ও আমার মতের গোলামী কর। অর্থাৎ শুধু আল্লাহই তোমার ইলাহ নন, আমিও তোমার একজন ছোট ইলাহ এবং আমার হকুম না মানলে আমার নিজের ক্ষমতার দ্বারা তোমাকে আল্লাহর বন্দেগী হতে খারিজ করে দেব—আল্লাহ তাআলা তাকে খারিজ করুন আর না-ই করুন। আর এ ধরনের কথা যারা বলে তাদের কথায় অন্য মুসলমান কাফের হোক বা না হোক কিন্তু সে নিজেকে কাফেরীর বিপদে জড়িয়ে ফেলে।

দীন ও শরীয়াতের পার্থক্য আপনারা ভাল করে বুঝতে পেরেছেন আশা করি। সেই সাথে একথা আপনারা জানতে পেরেছেন যে, বন্দেগীর বাহ্যিক নিয়মের পার্থক্য হলেও আসল দীনে কোনো পার্থক্য হয় না। অবশ্য তার জন্য শর্ত এই যে, মানুষ যে পন্থায়ই কাজ করুক না কেন, নেক নিয়তের সাথে করা কর্তব্য এবং একথা মনে রেখে করতে হবে যে, যে নিয়মে সে কাজ করছে, তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলেরই নিয়ম।

এখন আমি বলবো যে, দ্বীন ও শরীয়াতের এ পার্থক্য না বুঝতে পেরে আমাদের মুসলমান জামায়াতের কতই না অনিষ্ট হচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে নামায পড়ার নানা রকম নিয়ম আছে। একদল বুকের ওপর হাত বেঁধে থাকে, অন্যদল নাভির ওপর হাত বাঁধে। একদল ইমামের পিছনে মোকতাদী হয়ে আলহামদু সূরা পড়ে, আর একদল তা পড়ে না; একদল শব্দ করে ‘আমীন’ বলে, আর একদল বলে মনে মনে। এদের প্রত্যেকেই যে নিয়মে চলছে একথা মনে করেই চলছে যে, এটা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই নিয়ম। কাজেই নামাযের বাহ্যিক নিয়ম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এরা সকলেই সমভাবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগামী। কিন্তু যেসব যালেম লোক শরীয়াতের এসব খুঁটিনাটি মাসয়ালার বিভিন্নতাকে আসল দ্বীনের বিভিন্নতা বলে মনে করে নিয়েছে এজন্যই তারা নিজেদের আলাদা দল গঠন করে নিয়েছে, মসজিদ ভিন্ন করে তৈরি করেছে। একদল অন্যদলকে গালাগালি করে, মসজিদ হতে মেরে বের করে দেয়, মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করে এবং এভাবে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চাতকে টুকরো টুকরো করে দেয়।

এতেও এ শয়তানদের দিল ঠাণ্ডা হয় না বলে ছোট ছোট ও সামান্য ব্যাপারে একজন অপরজনকে কাফের, ফাসেক ও গোমরাহ বলে আখ্যা দিতে থাকে। এক ব্যক্তি কুরআন ও হাদীস হতে নিজ নিজ বুদ্ধি মতো আল্লাহর হৃকুম বের করে। এখন সে যা বুঝেছে সেই অনুসারে নিজের কাজ করাকেই সে যথেষ্ট বলে মনে করে না; বরং সে নিজের এ মতকে অন্যের ওপরও যবরাদতি করে চাপিয়ে দিতে চায়। আর অন্য লোক যদি তা মানতে রাজী না হয় তাহলে তাকে কাফের ও আল্লাহর দ্বীন হতে খারিজ মনে করতে শুরু করে।

মুসলমানদের মধ্যে আপনারা এই যে হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস ইত্যাদি নানা দলের নাম শুনতে পান এরা সকলে পবিত্র কুরআন ও হাদীসকে সর্বশেষ কিতাব বলে বিশ্বাস করে এবং নিজের নিজের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী তা থেকে আইন ও বিধান জেনে নেয়। হতে পারে একজনের সিদ্ধান্ত ঠিক ও বিশুদ্ধ, আর অন্যজনের সিদ্ধান্ত ভুল। আমিও একটা নিয়ম অনুসরণ করে চলি এবং তাকে শুন্দ বলে মনে করি। আর এর বিরোধী লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনাও করি—আমি যাকে শুন্দ বলে বুঝেছি, তা তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করি, আর যাকে আমি ভুল মনে করি, তার দোষ-ক্রটি ও তাদের বুঝাতে চাই। কিন্তু কারো সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া এক কথা আর দ্বীন হতে খারিজ হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। নিজ নিজ বিবেক অনুসারে শরীয়াতের কাজ করার অধিকার প্রত্যেক মুসলমানেরই আছে। দশজন মুসলমান যদি দশটি বিভিন্ন নিয়মে কাজ

করে, তবু যতক্ষণ তাঁরা শরীয়াত মানবে ততক্ষণ তাঁরা সকলেই মুসলমান, একই উস্থাতের মধ্যে গণ্য ; তাদের ভিন্ন ভিন্ন দল-গোষ্ঠী গঠন করার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু এ নিগৃত কথা যারা বুঝতে পারে না, তারা অতি ছোট ছেট ও সামান্য সামান্য কারণে দলাদলি করে। একদল অন্যদলের সাথে ঝগড়া বাঁধায়, নামায ও মসজিদ আলাদা করে, একদল অন্যদলের সাথে বিয়ে-শাদী, মিলা-মিশা এবং সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে বন্ধ করে দেয় আর নিজ মতের শোকদেরকে নিয়ে একটা আলাদা দল গঠন করে। মনে হয় তারা আলাদা নবীর উস্থাত।

আপনারা ধারণা করতে পারেন যে, এরূপ দলাদলির ফলে মুসলমানের কি বিরাট ক্ষতি হয়েছে। কথায় বলা হয় যে, মুসলমান একদল—এক উস্থাত। এ উপমহাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ৮ কোটি।^১ এতবড় একটা দল যদি বাস্তবিকই সংঘবন্ধ হতো এবং পরিপূর্ণ একতার সাথে আল্লাহর কালামকে বুলবুল করার জন্য কাজ করতো, তাহলে দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাদেরকে দুর্বল মনে করতে পারতো না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দলাদলির কারণেই এ উস্থাতটি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের একজনের মন অন্যজনের প্রতি বিশাঙ্গ ও শুদ্ধাদীন। বড় বড় বিপদের সময়ও তারা একত্রিত হয়ে বিপদের বিরুদ্ধে ঝুঁক্তে দাঢ়াতে পারে না। একদলের মুসলমান অন্যদলের মুসলমানকে ঠিক তত্ত্বানিই শক্ত বলে মনে করেন, যত্থানিই এক ইহুদী একজন খৃষ্টানকে শক্ত বলে মনে করে, বরং তা থেকেও অধিক। এমনও দেখা গেছে যে, একদল মুসলমানকে পরাজিত করার জন্য আর একদল মুসলমান কাফেরদের সাথে যোগ দিয়ে ষড়যন্ত্র করে। এমতাবস্থায় দুনিয়ার মুসলমান যদি দুর্বল হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এটা তাদের নিজেদেরই কর্মফল। তাদের ওপর সেই আয়াবই নায়িল হয়েছে যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন মজিদে বলেছেন :

أَوْيَلِسْكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَاسَ بَعْضٍ ۔-الانعام : ٦٥

“মানুষের প্রতি আল্লাহর এমন আয়াবও আসতে পারে, যার ফলে তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হবে, তোমরা পরম্পর কাটাকাটি করে মরবে।”—সূরা আল আনআম ৪ ৬৫

ওপরে যে আয়াবের কথা বলা হলো, এতদাখ্যলে তা খুব বেশী পরিমাণেই দেখা যায়। এখানে মুসলমানের নানা দল ; এমনকি আলেমদের দলেরও কোনো হিসেব নেই। এজন্যই এখানকার মুসলমান এবং আলেমদের কোনো

১. এ বৃক্তি ১৯৩৭-৩৮ সালে পাঠান কোটে (দুর্গল ইসলামে) প্রদত্ত হয়েছিল।

শক্তি নেই। আপনারা যদি বাস্তবিকই মঙ্গল চান, তবে আপনাদের ও আলেমদের এ বিভিন্ন দল ভেংগে দিন। আপনারা পরম্পরার পরম্পরার ভাই হিসেবে এক উচ্যাতরাপে গঠিত হোন। ইসলামী শরীয়াতে একুপ হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস প্রভৃতি আলাদা আলাদা দল গঠন করার কোনো অবকাশ নেই। একুপ দলাদলি মূর্খতার কারণেই হয়ে থাকে। নতুনা আল্লাহ তাআলা তো একটি মাত্র দল তৈরি করেছেন এবং সেই একটি মাত্র দলই হচ্ছে মুসলমান।

সমাপ্ত

